বাংলা

স্নাতকোত্তর (সি বি সি এস) কার্যক্রম

এম.এ. তৃতীয় সেমেস্টার

পত্র : এস ই সি/S E C

গবেষণা পদ্ধতি বিজ্ঞান

পাঠ-সহায়ক উপাদান

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ

(ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যান্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং)

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কল্যাণী, নদীয়া - ৭৪১ ২৩৫

পশ্চিমবঙ্গ

Post Graduate Board of Studies (PGBOS) Members of Department of Bengali, Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Sl. No.	Name & Designation	Role
1	**Prof. (Dr.) Sanjit Mondal,** Professor & Head, Department of Bengali, University of Kalyani.	Chairperson
2	**Prof. (Dr.) Sabitri Nanda Chakraborty** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
3	**Prof. (Dr.) Sukhen Biswas,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
4	**Prof. (Dr.) Prabir Pramanick,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
5	**Prof. (Dr.) Nandini Bandyopadhyay,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
6	**Prof. (Dr.) Adityakumar Lala,** Professor, Department of Bengali, Gourbanga University	External Nominated Member
7	**Prof. (Dr.) Narugopal Dey,** Professor, Department of Bengali, Sidho Kanho Birsha University	External Nominated Member
8	**Dr. Rajsekhar Nandi,** Assistant Professor of Bengali, DODL, University of Kalyani.	Member
9	**Dr. Shrabanti Pan,** Assistant Professor of Bengali, DODL, University of Kalyani.	Member
10	**Prof. (Dr.) Sanjib Kumar Datta,** Director, DODL, University of Kalyani	Convener

পাঠ প্রণেতা

অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস — বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক সঞ্জিৎ মণ্ডল — বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায় — বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
ড. তুষার পটুয়া — বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
ড. পীযূষ পোদ্দার — বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
ড. শান্তনু মণ্ডল — বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত — বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
ড. সীমা সরকার — বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

আগস্ট ২০২৩

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও ইস্ট ইন্ডিয়া ফটো কম্পোজিং সেন্টার, ২০৯এ, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ দ্বারা মুদ্রিত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইন অনুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের জন্য লেখক বা পাঠ প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Message

Satisfying the varied needs of distance learners, overcoming the obstacle of Distance and reaching the unreached students are the three fold functions catered by Open and Distance Learning (ODL) systems. The onus lies on writers, editors, production professionals and other personnel involved in the process to overcome the challenges inherent to curriculum design and production of relevant Self Learning Materials (SLMs). At the University of Kalyani a dedicated team under the able guidance of the Hon'ble Vice-Chancellorhas invested its best efforts, professionally and in keeping with the demands of Post Graduate CBCS Programmes in Distance Mode to devise a self-sufficient curriculum for each course offered by the Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Development of printed SLMs for students admitted to the DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2020 had been our endeavor. We are happy to have achieved our goal.

Utmost care and precision have been ensured in the development of the SLMs, making them useful to the learners, besides avoiding errors as far as practicable. Further suggestions from the stakeholders in this would be welcome.

During the production-process of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor **(Dr.) Amalendu Bhunia, Hon'ble Vice-Chancellor, University of Kalyani**, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it with in proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Sincere gratitude is due to the respective chairpersons as well as each and every member of PGBOS (DODL), University of Kalyani. Heartfelt thanks are also due to the Course Writers-faculty members at the DODL, subject-experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have enriched the SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I wouldespecially like to convey gratitude to all other University dignitaries and personnel involved either at the conceptual or operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their persistent and coordinated efforts have resulted in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyrights reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Professor (Dr.) Sanjib Kumar Datta
Director
Directorate of Open and Distance Learning
University of Kalyani

পাঠক্রম

বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম.এ. তৃতীয় সেমেস্টার

পত্র : এস ই সি/S E C

গবেষণা পদ্ধতি বিজ্ঞান

একক ১. গবেষণার সংজ্ঞা ও স্বরূপ **(Overall Idea—Meaning, Objectives, Types, Process etc.)**

একক ২. গবেষণার উদ্দেশ্য **(Objectives)** ও পদ্ধতি **(Steps & Design of Research)**

একক ৩. বিষয় নির্বাচন, শিরোনাম, অধ্যায় বিভাজন এবং নিবেদন, ভূমিকা ও উপসংহার রচনার পদ্ধতি

একক ৪. গবেষণার ভাষা ও ভাষাবয়নের কৌশল

একক ৫. তথ্যসংগ্রহ ও তথ্যবিশ্লেষণ **(Processing and Analysis of Data)**

একক ৬. সূত্রনির্দেশ/তথ্যসমীক্ষা/উল্লেখপঞ্জি এবং টীকা প্রদানের পদ্ধতি, গ্রন্থপঞ্জি/পত্রিকাপঞ্জি/রচনাপঞ্জি/ পরিশিষ্ট ছবি বা নথিপত্র প্রদান পদ্ধতি

একক ৭. ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার **(Interviewing)** গ্রহণ পদ্ধতি

একক ৮. প্রকল্প রচনার খুঁটিনাটি **(Time Management and Responsibilities in all sector),** টাইপ, প্রুফ সংশোধন ও এডিটিং

একক ৯. প্লেগারিজম

পাঠক্রম

বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম.এ. তৃতীয় সেমেস্টার

পত্র : এস ই সি/S E C

গবেষণা পদ্ধতি বিজ্ঞান

একক	শিরোনাম	পাঠ প্রণেতা	পৃষ্ঠা
১	গবেষণার সংজ্ঞা ও স্বরূপ (Overall Idea—Meaning, Objectives, Types, Process etc.)	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	১-৭
২	গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives) ও পদ্ধতি (Steps & Design of Research)	ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত	৮-১১
৩	বিষয় নির্বাচন, শিরোনাম, অধ্যায় বিভাজন এবং নিবেদন, ভূমিকা ও উপসংহার রচনার পদ্ধতি	অধ্যাপক সঞ্জিৎ মণ্ডল	১২-১৫
৪	গবেষণার ভাষা ও ভাষাবয়নের কৌশল	ড. শান্তনু মণ্ডল	১৬-১৭
৫	তথ্যসংগ্রহ ও তথ্যবিশ্লেষণ	ড. সীমা সরকার	১৮-২৫
৬	সূত্রনির্দেশ/তথ্যসমীক্ষা/উল্লেখপঞ্জি এবং টীকা প্রদানের পদ্ধতি, গ্রন্থপঞ্জি/পত্রিকাপঞ্জি/ রচনাপঞ্জি/পরিশিষ্ট ছবি বা নথিপত্র প্রদান পদ্ধতি	ড. পীযূষ পোদ্দার	২৬-৩০
৭	ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার (Interviewing) গ্রহণ পদ্ধতি	অধ্যাপক নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায়	৩১-৩৪
৮	প্রকল্প রচনার খুঁটিনাটি (Time Management and Responsibilities in all sector), টাইপ, প্রুফ সংশোধন ও এডিটিং	ড. তুষার পটুয়া	৩৫-৪৩
৯	প্লেগারিজম	অধ্যাপক সঞ্জিৎ মণ্ডল	৪৪-৪৮

একক - ১

গবেষণার সংজ্ঞা ও স্বরূপ

বিন্যাস ক্রম :

১.১ : ভূমিকা

১.২ : মৌলিক গবেষণা

১.৩ : ফলিত গবেষণা (ব্যবহারিক/মাঠ গবেষণা)

১.৪ : গবেষণাপত্রের বিভিন্ন নাম

১.৫ : প্রশ্নাবলী

১.৬ : সহায়ক গ্রন্থ

১.১ : ভূমিকা

গবেষণা কথাটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Research'। 'Re' শব্দের অর্থ 'পুনরায়' এবং 'Search' কথাটির অর্থ 'খোঁজা'। অর্থাৎ 'Research' শব্দের অর্থ হল 'পুনরায় খোঁজা'। অথবা যুক্তির দ্বারা বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোনও তত্ত্ব (Theory) উদ্ভাবন করা। অথবা প্রতিষ্ঠিত কোনও তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করে পুনরায় তা যাচাই করা।

প্রাচীনকাল থেকে মানুষ বিভিন্ন প্রাকৃতিক সমস্যার সঙ্গে সংগ্রাম করে বেঁচে আছে সমাজে। ক্রমশ এই সমস্যাগুলো প্রকট হচ্ছে আরও। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। মানুষ যুগে যুগে এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই সমস্যার উত্তর খোঁজার সঙ্গে জড়িয়ে আছে গবেষণা। উত্তর খোঁজা হয় গবেষণার মাধ্যমে। যেমন করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন। সারা দুনিয়া ভ্যাকসিনের জন্য গবেষণা করছে। কয়েক বছর আগে করোনা ভাইরাস পৃথিবীর কাছে একটা বড়ো মাপের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে তার ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেছে।

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে যুক্তিপূর্ণ নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত কোনও কিছু সম্পর্কে প্রচলিত জ্ঞানের সঙ্গে নতুন জ্ঞানের সংযোজন হল গবেষণা। এখানে কোনও বিষয় বা সমস্যা সম্পর্কে যুক্তিগত পদ্ধতির মাধ্যমে ধারাবাহিক অনুসন্ধানের দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ করে প্রচলিত জ্ঞানের উন্নত সাধন করা হয়। এর ফলে প্রচলিত কোনও ধারণা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হতে পারে। আবার নতুন নতুন প্রমাণের সাহায্যে তা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিতও হতে পারে।

গবেষণার স্বরূপ বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। যেমন জ্ঞানের সুশৃঙ্খল ও বৈজ্ঞানিক কৌশলভিত্তিক অনুসন্ধান হল গবেষণা। যে কোনও বিষয়ে সত্যানুসন্ধানই হল গবেষণার লক্ষ্য। সত্যকে খুঁজে পাওয়ার নিয়মতান্ত্রিক প্রচেষ্টা হল গবেষণা। মানুষের কল্যাণের জন্য এই পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে। এই পৃথিবী সম্পর্কে জানার নতুন নতুন প্রচেষ্টাই হল গবেষণা। যার মূল উদ্দেশ্য মানুষের কল্যাণের জন্য নতুন আবিষ্কার। কোনও সমস্যা বা বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞানলাভের বিধিবদ্ধ অনুসন্ধানই হল গবেষণা। নিশ্চিতরূপে সেটি হতে হবে একটি সুশৃঙ্খল অনুসন্ধান। যেখানে সমস্যা সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ, পর্যালোচনা ও সংকলনের মাধ্যমে নতুন কোনও মতবাদ বা তত্ত্ব গঠন করা হয়।

আবার বলা যায়, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে কোনও তথ্য অনুসন্ধানের সুকৌশল হল গবেষণা। যেখানে নির্দিষ্ট কোনও বিষয় বা সমস্যা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য বৈজ্ঞানিক ও নিয়মতান্ত্রিক অনুসন্ধান করা হয়। কোনও সমস্যা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সমাধান লাভের জন্য যে পদ্ধতিগত ও পরিশীলিত কৌশল ব্যবহার করা হয় তাকেই গবেষণা বলে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য প্রথমে একটি সমস্যা নির্বাচন করতে হয়। তারপর নির্বাচিত সমস্যাকে কেন্দ্র করে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। সংগৃহীত তথ্য যথাযথ বিশ্লেষণ করার পর সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়। প্রাচীনকাল থেকে গবেষণা প্রক্রিয়াটি ক্রমশ বিকাশ লাভ করেছে। কালে কালে পরিবর্তিত হয়েছে এর উদ্দেশ্য ও কাঠামো। তবে সবসময়ই এর মূল লক্ষ্য সত্যানুসন্ধান।

গবেষণা (Research) সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। যেমন—

1. 'Random House Dictionary of the English Language' (1966) গ্রন্থে বলা হয়েছে— "Research implies Diligent and systematic inquiry or investigat in into a subject in order to discover or revise facts– theories– applications."

2. Edwin R. A. Seligman তাঁর 'The Encyclopaedia of the Social Sciences' (1967) গ্রন্থে বলেছেন, Research as "the manipulation of things– concepts of symbols for the

purpose of generalising and to extend– correct or verify knowledge– whether that knowledge aids in the construction of a theory or in the practice of an art."

3. 'Oxford English Dictionary' (1989) অভিধানে বলা হয়েছে, Research is a, "search or investigation directed to the discovery of some fact by careful consideration or study of a subject." সেখানে আরও বলা হয়েছে, এটি "a course of critical or scientific enquiry."

4. The Webster's Third New International Dictionary (1961)-এর মতে, "studious inquiry or examination; esp : critical and exhaustive investigation or experimentation having for its aim the discovery of new facts and their correct interpretation– the revision of accepted conclusions– theories or laws."

5. James A. Black ও Dean J. Champion-এর লেখা 'Methods and issues in Social Research' (১৯৭৬) গ্রন্থে গবেষণা সম্পর্কে লেখা হয়েছে কিছু কথা। তার বাংলা তর্জমা এইরকম "বিভিন্ন চলকের মধ্যে সম্পর্কগুলো গবেষণা নকশার ছক অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক ভিত্তির মাধ্যমে যৌক্তিকভাবে উপস্থাপনকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা বলে।"

6. 'Scientific Social Surveys and Research' (1939) গ্রন্থে P. V. Young যে কথা বলেছেন, তার বাংলা তর্জমা এইরকম"নতুন তথ্যসমূহ আলোচনা বা পুরাতন তথ্যসমূহের অনুক্রম, আন্তঃ সম্পর্ক, কারণঘটিত ব্যাখ্যা এবং সেগুলির কার্যকারণ নিয়ম পরীক্ষা করার ধারাবাহিক পদ্ধতিই হচ্ছে গবেষণা।"

7. Robert B. Burns তাঁর 'Introduction to Research Methods' (2000) গ্রন্থে বলা কথাগুলি এই রকম গবেষণা আসলে, "কোন সমস্যার নির্দিষ্ট গুটিকয়েক প্রশ্নের নিয়মতান্ত্রিক, বস্তুনিষ্ঠ, ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের মাধ্যমে উত্তর খোঁজা।"

8. 'Methods of Social Research' (1994) গ্রন্থে Bailey Kenneth D. যা বলেছেন, তার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় "যে গবেষণাকর্ম সমাজের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করে তাকে সামাজিক গবেষণা বলে।"

9. 'The Romance of Research' (1933) গ্রন্থে L. V. Redman & A. V. H. Mory বলেছেন এইভাবে "গবেষণা হচ্ছে নতুন জ্ঞান লাভের একটি ধারাবাহিক প্রচেষ্টা।"

10. "বিশ্বের বিভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে প্রাথমিকভাবে বৈধ, বস্তুনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য জ্ঞান মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রতিষ্ঠা বা অর্জনের প্রক্রিয়াকে সামাজিক গবেষণা বলে।" এই কথাগুলি বাংলা তর্জমা করে দাঁড়িয়েছে 'Sociological Research Methods : An Introduction' (1977) গ্রন্থে লেখা ইংরেজি অংশের।

একথা ঠিক, জ্ঞানানুসন্ধানের আদর্শ বা মানসম্মত পদ্ধতির প্রয়োগ হল গবেষণা। সুসংঠিত জ্ঞানের আবিষ্কার ও বিকাশের লক্ষ্যে গবেষণা এগিয়ে চলে সামনের দিকে। কোনও না কোনও সমস্যা সমাধানের জন্য সবসময় সচেষ্ট থাকে গবেষণা। সঠিক ও পদ্ধতিগত অনুসন্ধান, কুশলী, নির্ভুল পর্যবেক্ষণ, সঠিক বর্ণনা এর জন্য প্রয়োজন। গবেষকেও হতে হবে নৈর্ব্যক্তিক ও যুক্তিযুক্ত। তাঁকে হতে হবে সাহসী, নিরপেক্ষ, ধীরস্থির। তাঁর ইচ্ছা শক্তি প্রবল হতে হবে। যাচাই শক্তিও থাকা দরকার। পর্যবেক্ষণ ও প্রখর বিশ্লেষণ দক্ষতা থাকতে হতে হবে গবেষকের।

গবেষণার কোনও বয়স নেই। যে কেউ, যে কোনও বয়সে গবেষণা করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে যে কোনও বিষয়ে গবেষণা হতে পারে। তবে শিক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণা করা বা করানোর নির্দিষ্ট মানদণ্ড আছে। যাই হোক, গবেষণাকর্মকে কয়েকটি পর্বে বিভাজন করা যেতে পারে। সেগুলো নিম্নরূপ—

১.২ : মৌলিক গবেষণা (Basic/Pure/Fundamental):

'Basic Research' বা 'Pure Research' বা 'Fundamental Research' বলা হয় মৌলিক গবেষণাকে। আদি বা মূল গবেষণা হল মৌলিক গবেষণা। বিশুদ্ধ গবেষণাও বলা হয় একে। মৌলিক গবেষণায় সাধারণীকরণ, তত্ত্ব তৈরি এবং জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে। মৌলিক নীতি ও সত্য আবিষ্কার করা হল এই গবেষণার মূল সুর। মৌলিক গবেষণা পরিচালিত হয় প্রাকৃতিক বা সামাজিক বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে। প্রচলিত জ্ঞান ও তত্ত্বের উন্নয়নের পরিধি সমৃদ্ধ করে মৌলিক গবেষণা। তাই তাত্ত্বিক গবেষণা হিসেবেও পরিচিত এটি। তত্ত্বের পরীক্ষা ও উন্নয়ন ঘটায় এই গবেষণা। এই গবেষণার আসল কাজ সাধারণীকরণ, তত্ত্ব প্রদান এবং জ্ঞানার্জন। নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার ও প্রচলিত বা পুরাতন তত্ত্বের উন্নয়ন সাধন করা এই গবেষণার মূল লক্ষ্য।

১.৩ : ফলিত গবেষণা (ব্যবহারিক/মাঠ গবেষণা)

ফলিত গবেষণা, ব্যবহারিক গবেষণা বা মাঠ গবেষণা নামেও পরিচিত। গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে বা কোনও বাস্তব সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পরিচালিত হয় ফলিত গবেষণা।

প্রাপ্ত তথ্যকে মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা করা ও প্রয়োগ করা হয়। সমাজ, শিল্প বা কোনও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে। যে সব সমস্যা রয়েছে সেগুলির তাৎক্ষণিক সমাধানের জন্য করা হয় ফলিত গবেষণা। এই গবেষণার প্রত্যক্ষ প্রয়োগ রয়েছে মানবকল্যাণের জন্য। অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে মানুষ ও সমাজের কল্যাণ করে ফলিত গবেষণা। ফলিত গবেষণায় প্রায়োগিক দিকটা বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারযোগ্য ও সঠিক সিদ্ধান্ত উদ্ভাবন করা গবেষকের মূল উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগত দিক থেকে মৌলিক ও ফলিত গবেষণা আলাদা হলেও পরস্পর নির্ভরশীল। পরস্পরের পরিপূরক। ফলিত গবেষণার কয়েকটি দিক লক্ষ্যণীয়—

১) **সম্ভাব্যতা অনুসন্ধান:** সামাজিক ক্ষেত্র উন্নয়ন বা কোনও সামাজিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচির বাস্তবতা যাচাই করা হল সম্ভাব্যতা অনুসন্ধান।

২) **পরীক্ষামূলক গবেষণা:** সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচীর যথার্থতা যাচাই বা ফলাফল মূল্যায়নের জন্য পরিচালিত অনুসন্ধানকে বলা হয় পরীক্ষামূলক গবেষণা। ল্যাবরেটরির পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ এই গবেষণা।

৩) **সামাজিক জরিপ:** গবেষণায় বহুল ব্যবহৃত একটি প্রক্রিয়া হল জরিপ। কোনও বিশেষ জনগোষ্ঠী বা দলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বা অন্য কোনও বিষয়ে প্রাথমিক অনুসন্ধানকে বলা হয় সামাজিক জরিপ। অর্থাৎ মাঠে নেমে এই ধরনের গবেষণা করতে হয়।

৮) **মূল্যায়ন গবেষণা:** কোনও পরিকল্পনা বা কর্মসূচির কার্যকারিতা বা সফলতা ও ব্যর্থতা যাচাইয়ের জন্য পরিচালিত গবেষণাকে বলে মূল্যায়ন গবেষণা।

১.৪ : গবেষণাপত্রের বিভিন্ন নাম

১. **অভিসন্দর্ভ (Thesis) :** উচ্চতর ডিগ্রি লাভের জন্য স্নাতকোত্তর পর্যায়ে যে গবেষণামূলক প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয় তাকে অভিসন্দর্ভ বা Thesis বলে। এর বিষয়পরিধি ব্যাপক। Thesis তৈরিতে মাঠ পর্যায়ের প্রাথমিক তথ্য, লাইব্রেরির পুস্তক, পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য ব্যবহৃত হয়। সাধারণভাবে ১০০ থেকে ৩০০ পাতার মধ্যে একটি Thesis-এর আকার হয়ে থাকে। সাধারণত পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য এই ধরনের গবেষণা করা হয়। একটি সম্পূর্ণ 'Thesis'-কে তিন ভাগে ভাগ করা হয়—

ক) পরিচিতিমূলক উপাদান (এখানে গবেষণাকর্মের পরিচিতিমূলক উপাদান থাকে)

খ) গবেষণার মূল প্রতিবেদন (এই অংশে গবেষণাকর্মের মূল প্রতিবেদন অধ্যায় আকারে বিন্যস্ত করা হয়)

গ) পরিশিষ্ট (নির্বাচিত গ্রন্থ, তথ্য পরিচিতি, ফটোগ্রাফ, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি)

২. **ডিজার্টেশান (Dissertation) :** গবেষণা প্রতিবেদনকে বলা হয় ডিজার্টেশান। কোনও বিষয়ের ওপর তত্ত্বালোচনামূলক প্রবন্ধকেও ডিজার্টেশান বলা হয়ে থাকে। এই গবেষণায় কাজের ব্যাপ্তিকাল ও আলোচনার পরিধি সীমিত। স্নাতকোত্তর ও উচ্চতর ডিগ্রি লাভের জন্য এই ধরনের গবেষণা হয়। সাধারণত এম.ফিল ডিগ্রির জন্য এই ধরনের গবেষণা করা হয়।

৩. **টার্ম পেপার (Term Paper) :** বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে একটি সংক্ষিপ্তকাল শেষে (১টি টার্ম ৩/৬ মাস) একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে মূল্যায়নের জন্য জমা দিতে হয় শিক্ষার্থীদের। সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে কোনও বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান করে লেখা প্রতিবেদনটি নাতিদীর্ঘ ও নাতিগূঢ় হয়। এর আলোচনা বিশদ নয়। টার্ম পেপারের আকৃতি ডিজার্টেশান পেপারের থেকে সংক্ষিপ্ত হয়।

৪. **প্রকল্পকর্ম (Project Work) :** বিশ্ববিদ্যালয় পর্বের শেষে বিজ্ঞানসম্মত পন্থা অনুসরণের মাধ্যমে কোনও বিষয় সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ করে, সেই তথ্যগুলোকে প্রক্রিয়াজাত করে রীতিবদ্ধভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পর প্রতিবেদনে রূপান্তরিত করে মূল্যায়নের জন্য জমা দিতে হয়। এই কর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে সময় লাগে এক বছর। অপেক্ষাকৃত বড় হয় প্রকল্প প্রতিবেদনের আয়তন। শিক্ষার্থীদের কাছে টার্ম পেপার অপেক্ষা প্রকল্পকর্মের কাজগুলো বেশি অর্থবহ হয়ে থাকে। প্রকল্পকর্মের কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পরবর্তীকালে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা পরিচালনা ও থিসিস উপস্থাপনের জ্ঞানলাভ করে।

১.৫ : প্রশ্নাবলী

১) গবেষণার সংজ্ঞা ও স্বরূপ বুঝিয়ে দাও।

২) গবেষণার স্বরূপ বিশ্লেষণের পাশাপাশি গবেষণাপত্রের বিভিন্ন নামের পরিচয় দাও।

১.৬ : সহায়ক গ্রন্থ

১) ড. সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায় : 'গবেষণা : প্রকরণ ও পদ্ধতি' (২০২২)

২) ড. তারকনাথ ভট্টাচার্য : 'গবেষণা তথ্য ও প্রয়োগ' (২০১২)

৩) জগমোহন মুখোপাধ্যায় : 'গবেষণাপত্র অনুসন্ধান ও রচনা' (২০০৬)

৪) ড. জয়ন্ত গোস্বামী : 'সম্পাদনা-ভিত্তিক গবেষণা পদ্ধতি ও প্রয়োগ' (১৯৯১)

৫) ড. জয়ন্ত গোস্বামী : 'তুলনামূলক সাহিত্য গবেষণা পদ্ধতি ও প্রয়োগ' (১৯৯৫)

একক - ২

গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives) ও পদ্ধতি (Steps & Design of Research)

বিন্যাস ক্রম :

২.১ : ভূমিকা

২.২ : গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives)

২.৩ : পদ্ধতি

২.৪ : প্রশ্নাবলী

২.৫ : সহায়ক গ্রন্থ

২.১ : ভূমিকা

গবেষণা শব্দটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে অনুসন্ধান। গবেষণার উদ্দেশ্য সত্যকে আবিষ্কার করা। শব্দটি বাংলায় এসেছে ইংরেজি 'research' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে। যার আক্ষরিক অর্থ 'পুনরনুসন্ধান'। 'গবেষণা' যতটা সম্ভব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তথ্য অনুসন্ধানের এক প্রক্রিয়া। Robert Ross-এর মতে, "Research is essentially an investigation– a recording– and an analysis of evidence for the purpose of gaining knowledge." (Robert Ross Research - an Introduction– Chapter I– p. 4)

২.২ : গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives)

মনে রাখতে হবে গবেষক শুধুমাত্র তথ্যের সংগ্রাহক ও সংকলক নন। একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করে তাকে বিশ্লেষণ করে তার অন্তর্নিহিত সত্যকে প্রকাশ করাই তার কাজ। এক কথায় একটি গূঢ় সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর আগে কোনও বিষয় সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তা ও পর্যালোচনা এবং বিভিন্ন বিষয়ের

মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করাও গবেষণার উদ্দেশ্য। কোনও বিশেষ দর্শন বা মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হলে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা যায় না। তাই তথ্য, যুক্তি ও পরিসংখ্যানের উপর নির্ভর করে গবেষককে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয়।

বিভিন্ন উদ্দেশ্যেই গবেষণাপত্র রচিত হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি লাভ ছাড়াও স্বাধীন গবেষণাও হতে পারে। গবেষণা শুরু করার আগে গবেষককে নির্ধারণ করতে হয় গবেষণার উদ্দেশ্য ও বার্তা। গবেষণা যদি পুরানো বিষয় ও তথ্যের পুনরাবৃত্তি হয় তবে সেই গবেষণার উদ্দেশ্য ব্যর্থ। গবেষণার লক্ষ দুই ভাবে পূর্ণ হতে পারে। নতুন তথ্য আবিষ্কারের মাধ্যমে বা পুরানো তথ্যের নতুন ব্যাখ্যার মাধ্যমে। বিষয় হিসেবে গবেষণার প্রকৃতি নানারকম হয়। কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য বিষয়ক গবেষণায় পদ্ধতিগত বৈচিত্র থাকে। এখানে মূলত সাহিত্য বিষয়ক গবেষণার পদ্ধতিই আলোচিত হবে।

২.৩ : পদ্ধতি

সাধারণত গবেষণার তিনটি স্তর লক্ষ করা যায় ১) অনুসন্ধান (Finding) ২) বিন্যাস (Arrangement) ৩) অভিব্যক্তি (Expression)। তবে আধুনিক গবেষণায় আরও সূক্ষ্ম ও নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

বিষয় নির্বাচন (Choice of subject) : বিষয় নির্বাচন গবেষণার প্রথম কাজ। গবেষকের পছন্দ ও দক্ষতা অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন করা উচিৎ। এ ছাড়া গবেষণার বিষয় নির্ভর সাজসরঞ্জাম, গ্রন্থাগারের সুবিধা আছে কি না সেটাও দেখে নিতে হবে। গবেষণার ক্ষেত্রে বিস্তৃত (Broad Topic) ও ব্যাপক (Extensive) বিষয় নির্বাচন না করাই ভালো। তবে যে বিষয়ই হোক না কেন তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য থাকতে হবে। বিষয়টিকে নির্ভুল স্বচ্ছতায় নির্ভুল তথ্যে বিশদভাবে আলোচনা করতে হবে। গবেষণাপত্রের একটি নির্দিষ্ট আকার বা অবয়ব থাকলেও আকৃতি হ্রাস করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রমাণ বর্জন বা বিক্ষিপ্ত উপস্থাপন করা উচিৎ নয়। নির্দিষ্ট সময়, নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে গবেষণার কাজ সম্পূর্ণ করা যাবে কি না সেটাও বিষয় নির্বাচন পর্বে ভেবে রাখতে হবে। সর্বোপরি নির্বাচিত বিষয়টির গ্রহণযোগ্যতার দিকটিও বিচার করতে হবে।

বিষয়কেন্দ্রিক তথ্য নির্বাচন : উপকরণ সংগ্রহ (Data Collection) : বিষয় অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা এই পর্বের প্রধান কাজ। তথ্য সংগ্রহের প্রধান উৎস অবশ্যই গ্রন্থাগার। নির্বাচিত বিষয়ে এযাবৎ লব্ধ তথ্যসমূহ ও গ্রন্থ সম্পর্কেও গবেষককে অবহিত হতে হবে। দুই ধরনের উৎস ব্যবহার করে গবেষক উপাদান সংগ্রহ করতে পারেন। প্রাথমিক বা মূল উৎস (Primary source) ও সহায়ক বা গৌণ উৎস (Secondary source)।

সংগৃহীত উপাদানের বিন্যাস (Arrangement of data) : সংগৃহীত তথ্যের যথাযথ ব্যবহার এই পর্বের প্রথম কাজ। বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য শ্রেণি বিন্যাস করে প্রাসঙ্গিকতা অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে। প্রাপ্ত তথ্য যে সবসময় নির্ভুল নয় সেটি গবেষককে মাথায় রাখতে হবে। তুলনামূলক ও বৈপরীত্যমূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিভিন্ন তথ্যের সংশ্লেষ করা উচিৎ।

বিশ্লেষণের পর্ব (Stage of Analysis) : গবেষক সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী মনোভাব প্রয়োগ করে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি নির্বাচন করবেন ও অপ্রাসঙ্গিক অংশগুলি বর্জন করবেন। অর্থাৎ গবেষণাকর্মটির একটি অস্থায়ী সামগ্রিক পরিকল্পনা এই পর্বে ঘটে।

উপাদানের চূড়ান্ত নির্বাচন (Final selection of data) : পূর্ববর্তী স্তরে প্রাথমিক বিশ্লেষণের পরে গবেষকের একটি স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে এই পর্বে। বিচার ও পর্যালোচনার মাধ্যমে বিষয়টি থেকে স্বল্প প্রাসঙ্গিক অংশগুলো বাদ দেওয়া হয় এই সময়ে।

উপাদানের পুনমূল্যায়ন (Reassessment of data) : প্রথম পর্ব থেকে বেশ কয়েকটি পর্ব অতিক্রম করার পরে গবেষক একটি অভিজ্ঞতাজনিত দর্শন লাভ করেন। তার চিন্তাভাবনা আরও পরিণত হয় এবং তথ্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে তিনি লেখার প্রস্তুতি নেন।

গবেষণাপত্র লেখার পর্ব (Stage of writing) : অর্জিত তথ্য প্রমাণ ও চিন্তাভাবনার শেষ স্তর গবেষণাপত্র রচনা। গবেষণার শুরুতে গবেষকের যে মনোভাব থাকে তথ্যপ্রমাণাদি নির্বাচন ও বিশ্লেষণের পরে অনেক সময়ই তার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়। নতুন চিন্তা, নতুন উপলব্ধি বা নতুন করে পাওয়া কোনও তথ্যসূত্রে গবেষকের ধারণা বদলে যেতে পারে। এই কারণে এই পর্বে পুর্নবিবেচনা জরুরি। এই পুনর্বিবেচনার প্রেক্ষিতেই গবেষক তাঁর গবেষণাপত্রটি প্রস্তুত করবেন।

গবেষণাপত্র লেখার পদ্ধতি (Writing of thesis) : গবেষণাপত্রে তিনটি আবশ্যক উপাদান

১) **ভূমিকা :** ভূমিকা লেখা উচিৎ গবেষণাপত্র লেখার শেষে। গবেষণাপত্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নিয়েই আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব নির্দেশ করতে হয়। বিষয়টি সম্পর্কে পূর্বে কোনও আলোচনা হয়েছে কি না বা হলেও এই আলোচনাটির অভিনবত্ব কোথায় তা ভূমিকা বা মুখবন্ধে বলতে হয়।

২) **মূল আলোচনা :** এখানে গবেষণার কাঠামোটি নির্দেশ করে অধ্যায় বিভাজনের মাধ্যমে যুক্তি ও তথ্য বিশ্লেষণের ক্রমটি গড়ে তুলতে হয়। গবেষকের ভাবনার সুসংবদ্ধ রূপ মূল আলোচনায় থাকে।

৩) **উপসংহার :** প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোচনার সারসংক্ষেপ করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি এখানে উপস্থাপন করতে হবে। দৈর্ঘ্য বিচারের চেয়ে সুসংহত সিদ্ধান্তের সুবিন্যস্ত রূপই কাম্য। অর্থাৎ গবেষণা শেষে গবেষকের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় তা যতই সংক্ষিপ্ত হোক।

গবেষণার শেষ পর্ব বিবলিওগ্রাফি (Bibliography) বা গ্রন্থপঞ্জী-গবেষণাপত্রের শেষে গবেষক তাঁর গবেষণাকর্মে ব্যবহৃত পুস্তক, জার্নাল, ডায়েরি, চিঠিপত্র প্রভৃতির একটি বিস্তৃত তালিকা উপস্থিত করেন, যাতে আগ্রহী পাঠক প্রয়োজন মতো সেগুলির সাহায্য নিতে পারেন। গ্রন্থাবলির এই তালিকা সর্বদা বর্ণানুক্রমিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

২.৪ : প্রশ্নাবলী

১) গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি বুঝিয়ে দাও।

২) গবেষণা শব্দটির অর্থ কী? গবেষণাপত্র কীভাবে লেখা হয় তা বিশদে বর্ণনা করো।

২.৫ : সহায়ক গ্রন্থ

১) ড. সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায় : ‘গবেষণা : প্রকরণ ও পদ্ধতি’ (২০২২)

২) ড. তারকনাথ ভট্টাচার্য : ‘গবেষণা তথ্য ও প্রয়োগ’ (২০১২)

৩) জগমোহন মুখোপাধ্যায় : ‘গবেষণাপত্র অনুসন্ধান ও রচনা’ (২০০৬)

৪) ড. জয়ন্ত গোস্বামী : ‘সম্পাদনা-ভিত্তিক গবেষণা পদ্ধতি ও প্রয়োগ’ (১৯৯১)

৫) শ্রাবণী পাল ও বেলা দাস : ‘গবেষণার তত্ত্বতালাশ’ (২০২১)

একক - ৩

বিষয় নির্বাচন ও শিরোনাম

বিন্যাস ক্রম :

৩.১ : ভূমিকা

৩.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩.১ : ভূমিকা

গবেষণাকর্মের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক বিষয় নির্বাচন। বলা যেতে পারে, গবেষণা ক্ষেত্রে প্রবেশের প্রথম ধাপ এই বিষয় নির্বাচন। গবেষণাকার্যে প্রবেশের আগে ছাত্র-ছাত্রী নিজের বিভাগে বা অন্যত্র গবেষণার আগ্রহের কথা প্রকাশ করেন। কখনো সেই আগ্রহী ছাত্রছাত্রী সরাসরি তিনি কী বিষয় নিয়ে কাজ করতে চান, সেই আগ্রহের কথা জানান। আবার কখনও সেই তত্ত্বাবধায়কের ওপর ছেড়ে দেন। তত্ত্বাবধায়ক তাঁর নিজের পছন্দমতো কিংবা সেই গবেষকের আগ্রহের বিষয় থেকে বিষয় নির্বাচন করেন। স্বভাবতই আমাদের প্রশ্ন আসে গবেষণার বিষয় কী হতে পারে। প্রথমেই দেখে নেওয়া যেতে পারে আগ্রহী গবেষকের স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে বিশেষপত্র হিসেবে কী ছিল। ভাষাতত্ত্ব, নাটক, কথাসাহিত্য, উনিশ শতক, রবীন্দ্র সাহিত্য, মধ্যযুগের সাহিত্য, বাংলা কাব্যকবিতা, লোকসাহিত্য অর্থাৎ একজন স্নাতকোত্তর বর্ষের ছাত্রছাত্রী কী বিশেষপত্র পড়ে আসেন, সে বিষয় থেকে গবেষণার বিষয় নির্বাচন করতে পারেন। এগুলি হল বৃহত্তর ক্ষেত্রে। এই বিশেষপত্র থেকে আবার অন্যতর মানদণ্ডে বিষয় নির্বাচন অর্থাৎ বিজ্ঞান, ইতিহাস, পুরাণ, ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, তত্ত্ব, আঙ্গিক, শৈলি, পরিবেশ, দেশ-রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিকতা, আন্দোলন (রাজনৈতিক ও সাহিত্য), চুক্তি, ইজম বা মতবাদ, সমাজ, সম্পর্ক- এরকম কোন বিষয়কে গবেষণার বিষয়

নির্বাচন করতে হয়। ধরা যাক বিষয় হল বিজ্ঞান। এবার বিশেষপত্রের কোন একটি থেকে বিজ্ঞান অনুষঙ্গ বেছে নিতে হবে।তারপর আসবে কোন্ সংরূপ বেছে নেব। কাব্য- উপন্যাস- নাটক- প্রবন্ধ- ছোটোগল্প- তাঁর মধ্য থেকে একটি সংরূপ নির্বাচন করতে হয়। তারপর সেই সংরূপের অন্তর্গত কোন লেখক হতে পারেন, কয়েকজন লেখক হতে পারেন, তাঁদের মধ্যে তুলনা-প্রতিতুলনা আসতে পারে অথবা বিজ্ঞানের কোন প্রবণতা বা চেতনা নিয়ে কাজ করা যেতে পারে। এভাবে বড় প্রেক্ষিত থেকে ক্রমশ ছোট প্রেক্ষিতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয়। ক্রমটি দেখে নেওয়া যেতে পারে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য > বিশেষপত্র > বিশেষপত্রকে সামনে রেখে কোন বিষয় > সংরূপ—একটি সংরূপের অন্তর্গত কোন একজন লেখক বা লেখকের প্রবণতা বা সামাজিক প্রবণতা।

কিন্তু সেই নির্বাচিত বিষয়টিকে প্রকাশ করতে হবে বৃহত্তর প্রেক্ষিতে। অনেকটা বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের মত। সেই কেন্দ্রীয় বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে পরিপূর্ণভাবে। যেকোন প্রকল্পে আবেদন করতে গেলে যেমন উল্লেখ করতে হয় সেই গবেষণা প্রকল্পটির জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্ব, তেমনি গবেষণার বিষয় নির্বাচনে দৃষ্টি দিতে হয়, সেই বিষয়টি দেশীয়, আন্তর্জাতিক স্তরে, সমাজে, প্রতিষ্ঠানের কোন নতুন দিকের সন্ধান দিতে পারে কিনা। অতি সম্প্রতি পরিবেশ বিষয়ক, পপুলার সায়েন্স যেগুলো মানুষ, মানবিকতা, মানুষের বেঁচে থাকার পথের হদিশ দেয়, মানুষের মনন, সত্তার বিকাশ ঘটায় সেসমস্ত বিষয় গবেষণার ক্ষেত্রে নির্বাচন করলে দেশ ও সমাজের মঙ্গল হয়।

সাহিত্যের কোন নতুন তত্ত্ব, কোন বিশেষ মতাদর্শ, কোন বৃহত্তর আন্দোলনের ফলশ্রুতি যা মানুষ সমাজকে পাল্টে দেয়, সাহিত্যের ফর্ম পাল্টে দেয়- তেমন বিষয় নির্বাচন করা যেতে পারে। এখন ইউ জি সি সহ বিভিন্ন গবেষণা সংস্থা ইন্টার ডিসিপ্লিনারি বা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে বলেন। বর্তমানে মানুষ সাইকোলজিক্যাল ডিস-অর্ডারে ভুগছেন, মনের দিক থেকে মানুষ ভীষণ একাকী। সুতরাং সাহিত্যে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক জট-জটিলতার বিষয়টি আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতকে সামনে রেখে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

একজন ছাত্র বা ছাত্রী স্নাতকোত্তর পর্বে, এম.ফিল গবেষণা করতে করতেই সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্য সংক্রান্ত নানা ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে। যেমন কোনো গল্প, উপন্যাস, কবিতা পড়ে সেই বিশেষ সাহিত্য সংরূপ উদ্ভাবনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞানলাভের ইচ্ছে হতে পারে। সেই প্রেক্ষিতে কোনো বিশেষ একটি কালের বিশেষ প্রবণতার আলোকে পছন্দের বিষয়টিকে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। মোটামুটি তাতেই গবেষণার শিরোনাম সংক্রান্ত ধারণা করে ফেলা সম্ভব।

- এমন একটি বিষয় নির্বাচন করা প্রয়োজন যা একজন গবেষককে পূর্ববর্তী কার্যপ্রতিবেদন বা ব্যাকগ্রাউন্ড সর্ম্পকে পড়তে ও বুঝতে সক্ষম করবে। বিষয় উপযোগী ও সুনির্দিষ্ট কিছু প্রশ্ন এক্ষেত্রে সহায়ক। উদাহরণস্বরূপ, নির্বাচিত বিষয়টির বর্তমান সামাজিক, অর্থনৈতিক, বা রাজনৈতিক বিতর্কের ওপর কি কোনো দৃঢ় মতামত আছে বা থাকলেও তার পরিসীমা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত?

- প্রাসঙ্গিক ও বিশদ লিটারেচার রিভিউ বা সাহিত্য পর্যালোচনা নির্বাচিত বিষয়ের কি-ওয়ার্ড অনুসন্ধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত। ব্যাকগ্রাউন্ড অধ্যয়নের সময় সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত নিবন্ধসমূহকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। একটি বিস্তৃত সারসংক্ষেপ নির্বাচিত ধারণাটির বিস্তৃতি, সীমাবদ্ধতা এবং জিজ্ঞাসিত বা উদ্ধৃত প্রশ্নসমূহের উত্তর ও সম্পৃক্ততা প্রকাশ করতে সক্ষম।

- নির্বাচিত বিষয়ের উপর ফোকাস করতে হবে। নির্বাচিত বিষয়টি খুব বিস্তৃত বা সঙ্কীর্ণ হলে উক্ত বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করা খুব কঠিন। একটি বিষয় সুনির্দিষ্ট, সীমাবদ্ধ, তথ্যপূর্ণ, পরিচালনাযোগ্য করার কিছু সাধারণ উপায় হলো নির্বাচিত বিষয়টিকে বিষয়-সম্পর্কিত কিছু নির্দিষ্ট উপাদান দ্বারা আবদ্ধ বা সীমাবদ্ধ করা। যেমন, ভৌগোলিক এলাকা, সাংস্কৃতিক অবকাঠামো, টাইমফ্রেম, নির্দিষ্ট ব্যবহারবিধি ইত্যাদি।

- যে সকল শব্দ বা শব্দগুচ্ছ নির্বাচিত বিষয়কে সঠিক ও সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করতে সক্ষম, তাদের কি-ওয়ার্ড সন্ধান করতে হবে। ব্যাকগ্রাউন্ড তথ্য অধ্যয়নের সময় তালিকাভুক্ত কি-ওয়ার্ডগুলোর বিস্তৃতি, ব্যবহার ও উপযোগিতা নির্বাচিত বিষয়টির মূল ধারণাগুলোকে সমন্বিত করতে সহায়তা করবে।

- গবেষণা চলাকালীন গবেষণা বিষয়ের পরিবর্ধন, পরিমার্জন, পরিবর্তন ও পরিশোধন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া চলাকালীন যা পাওয়া গেল, তা সম্পর্কে একজন গবেষক নিশ্চিত নাও হতে পারেন। ফলে ফোকাসকে সঙ্কুচিত বা প্রসারিত করার প্রয়োজন হতে পারে।

মোটামুটিভাবে এই ধাপগুলি পেরোনো মানেই সংহত, সম্পূর্ণ ও গবেষণার স্ট্রাকচার প্রকাশক শিরোনামটি নির্ধারণ করে ফেলা। গবেষক তার গাইডের অনুমতিক্রমে এবার গবেষণা কার্যটি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। অনুসন্ধান করতে করতে গবেষণার অভিমুখ খানিক পরিবর্তিত হলে গাইডের সঙ্গে একাডেমিক আলোচনা সাপেক্ষে শিরোনামটিও প্রয়োজনে পরিবর্তিত করা সম্ভব। শিরোনামটি হবে বিজ্ঞানসম্মত, যথাযথ। কখনোই তা ব্যঞ্জনাধর্মী বা কাব্যধর্মী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। শিরোনামে উল্লেখিত শব্দ

এবং বিষয়সমূহ অধ্যায় বিভাজনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে। শিরোনামেই স্পষ্ট হবে গবেষণাকর্মের সময়পর্ব, প্রবণতা, লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন। যেমন ধরা যাক: সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোর সাহিত্যের ভুবন-বিষয় বৈচিত্র্য ও নির্মাণশিল্প। এই শিরোনামকে সামনে রেখে আমরা বিষয়টিকে সাতটি অধ্যায়ে বিভাজিত করতে পারি। যথা-

প্রথম অধ্যায়- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়: সাধারণ পরিচয়

দ্বিতীয় অধ্যায়- কিশোর সাহিত্য- স্বরূপ বৈশিষ্ট্য

তৃতীয় অধ্যায়- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোর সাহিত্যের বিষয়বৈচিত্র্য

চতুর্থ অধ্যায়- এডভেঞ্চার এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোর সাহিত্য

পঞ্চম অধ্যায়- কল্পবিজ্ঞান সাহিত্য ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোর সাহিত্যে কিশোর কিশোরীরা

সপ্তম অধ্যায়- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোর সাহিত্য- নির্মাণশিল্প প্রেক্ষিতে

এছাড়া ভূমিকা, উপসংহার, গ্রন্থপঞ্জি এই অধ্যায় বিভাজনের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক।

৩.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষণার বিষয় নির্বাচন কতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে তুমি মনে করো।

২। গবেষণার ক্ষেত্রে শিরোনাম নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—উপযুক্ত দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

৩। একটি গবেষণা সন্দর্ভের শিরোনাম নির্বাচন করে বিভাজিত অধ্যায়গুলির পরিচয় দাও।

৪। গবেষণা কর্মে অধ্যায় বিভাজনের কারণ এবং বিভাজনের পদ্ধতিগুলির বিস্তৃত পরিচয় দাও।

৩.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী:

১। শ্রাবণী পাল বেলা দাস সম্পা. গবেষণার তত্ত্বতালাশ, পারুল প্রকাশনী, ২০২১।

২। সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়, গবেষণা: প্রকরণ ও পদ্ধতি, দে'জ পাবলিশিং, ২০২০।

৩। জগমোহন মুখোপাধ্যায়, গবেষণাপত্র অনুসন্ধান ও রচনা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৮।

একক - ৪

গবেষণার ভাষা ও ভাষাবয়নের কৌশল

বিন্যাস ক্রম :

৪.১ : ভূমিকা

৪.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৪.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৪.১ : ভূমিকা

গবেষণার ভাষা যথাসম্ভব অনাসক্ত, নিরপেক্ষ ও নিরাপেক্ষ হওয়া উচিত। "আমি"-র প্রক্ষেপ না-হওয়াই ভালো। "আমরা বলি" না বলে "এ কথা বলা যেতে পারে যে" লেখা ভালো। কাউকে তীব্র আক্রমণ করা যাবে না, কাউকে উচ্ছসিত প্রশংসা করা যাবে না। "অনন্যসাধারণ", "আশ্চর্য" ইত্যাদি কথার বদলে "উল্লেখযোগ্য", "বিখ্যাত", "প্রসিদ্ধ", "মৌলিক" ইত্যাদি কথাগুলি ব্যবহার করতে হবে। "উনি বিষয়টা বোঝেন নি" না বলে বলা উচিত "ওঁর এই সিদ্ধান্ত নানা কারণে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে না"। "খুব" "অত্যন্ত" ইত্যাদি বোঝাতে "ভীষণ" "দারুণ" ইত্যাদি লেখা যাবে না। প্রশ্নবাক্যের ব্যবহার বেশি করা যাবে না, মূলত বিচার এবং বিবৃতিই যেন বেশি থাকে।

উপরের এই আলোচনাটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে গবেষণার ভাষার দুটি দিক আছে। এক হল ভাষাটির একটি নিজস্ব গাম্ভীর্য রক্ষা করা দরকার, যাতে "ভুল করেছেন", "বাজে বকেছেন", "প্রলাপ বকেছেন", "দারুণ বলেছেন" এই ধরনের অনুকূল বা প্রতিকূল আবেগের লঘু কথা বলা সংগত হবে না। গবেষক সব সময় একটি ব্যক্তিগত দূরত্ব রক্ষা করবেন। দ্বিতীয়ত, এর সঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবেই, একটি সামাজিক

সৌজন্য রক্ষা করতে হবে। মনে রাখতে হবে, যিনি ভুল করেন, তিনিও গবেষণায় সাহায্য করেন। ভুল ধরিয়ে দেওয়ার সুযোগ তৈরি করে।

বানান রীতি সম্বন্ধে অনেকে ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। উচ্চতম শিক্ষিকারও অনেক সময় বানান ভুল করে থাকেন এবং সবাই এ বিষয়ে সচেতনও নন। তা দেখিয়ে দিলে অনেক সময় বলেন "ওই তো বাংলা আকাডেমি সব হ্রস্ব ই-কার হ্রস্ব উ-কার করে সব সহজ করে দিয়েছে, মূর্ধন্য ণ তুলে দিয়েছে।" কথাটা একেবারেই সত্যি নয়। প্রয়োজনে বাংলা আকাডেমির বানানের নিয়ম দেখা যেতে পারে বা বাজারে প্রচলিত বানান অভিধান দেখা যেতে পারে। এমনকি অশোক মুখোপাধ্যায়ের "সংসদ বাংলা বানান অভিধান"ও দেখা যেতে পারে।

৪.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। গবেষণা কর্মে ভাষাবয়ানের কৌশল সম্পর্কে একজন গবেষকের দায়িত্ব কী হওয়া উচিত বলে তুমি মনে করো তার বিবরণ দাও।

৪.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী:

১। শ্রাবণী পাল, বেলা দাস, সম্পা—গবেষণার তত্ত্বতালাশ, পারুল প্রকাশনী, ২০২১।

২। সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়, গবেষণা : প্রকরণ ও পদ্ধতি, দে'জ পাবলিশিং, ২০২০।

৩। জগমোহন মুখোপাধ্যায়, গবেষণাপত্র অনুসন্ধান ও রচনা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৮।

একক - ৫

তথ্যসংগ্রহ ও তথ্যবিশ্লেষণ
(Processing and Analysis of data)

বিন্যাস ক্রম :

৫.১ : তথ্য সংগ্রহ (Data Collection)

৫.২ : প্রাথমিক বা মূল উৎস (Primary Source)

৫.৩ : সহায়ক বা গৌণ উৎস

৫.৪ : তথ্যের শ্রেণিকরণ, বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা প্রদান

৫.৫ : তথ্যঋণ

৫.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৫.১ : তথ্য সংগ্রহ (Data Collection)

তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কথা হল, গবেষকের অনুসন্ধানের ব্যাপ্তি ও গভীরতা। সাহিত্যিক গবেষণার ক্ষেত্রে বিবিধ সমালোচনামূলক গ্রন্থ, আত্মজীবনী, বিচিত্র নান্দনিক মূল্যবোধ ও মতবাদ এই সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। তথ্য সংগ্রহের পর গবেষককে তার প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনীয়তা বুঝে এই সকল তথ্যের যথাযথ ব্যবহার করতে হবে। এইসব তথ্য বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে তুলনামূলক ও বৈপরীত্যমূলক মূল্যায়নের মধ্য দিয়েই প্রয়োগ করা উচিত। পরিশেষে, গবেষককে মনে রাখতে হবে, সংগৃহীত তথ্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো ভাবাবেগ, যুক্তিবর্জিত মতপ্রাধান্য নয়, বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গিই তার বক্তব্যকে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে। গবেষককে সর্বদা মনে রাখতে হবে, যা ছাপার হরফে প্রকাশিত তাই সর্বদা নির্ভুল বা গ্রহণযোগ্য নয়, আর সেই কারণেই তথ্যগুলির সচেতন পরীক্ষা ও সততা যাচাই করা একান্ত কর্তব্য।

তথ্য সংগ্রহের কাজে প্রথম প্রয়োজন পঠনের। বিষয়কেন্দ্রিক সাহায্যকারী (Reference) পুস্তকের প্রতিটি শব্দ পাঠ করা গবেষকের পক্ষে সম্ভব নয়, আবশ্যকও নয়। ত্বরিত ও বিচ্ছিন্ন পঠন গবেষণার পক্ষে কখনো সহায়ক হয় না। গবেষকে পর্যবেক্ষণ শক্তি, তাৎক্ষণিক স্মৃতিশক্তি, কল্পনার ব্যাপ্তি ও বিশ্লেষণী দৃষ্টির সমন্বয় এই পঠন ও তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

একজন গবেষক যে ধরনের কাজই করুন না কেন তাঁকে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। লিখিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে যিনি Text নির্ভর কাজ করবেন তাঁকে text সংগ্রহ করতে হবে। যথাযথ এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য-সংগ্রহের উপরই গবেষণামূলক সমস্যার যথার্থ আলোকপাত নির্ভর করে। তথ্য দুই ধরনের হয়—প্রত্যক্ষ তথ্য (Primary Data) ও পরোক্ষ তথ্য (Secondary Data)। যে তথ্য বা সংবাদ পর্যবেক্ষণ একক সমূহের কাছ থেকে প্রথম সংগৃহীত হয় তা হল প্রত্যক্ষ তথ্য। যে তথ্য বা সংবাদ অন্যের প্রতিবেদন, সরকারি নথিপত্র ইত্যাদি থেকে সংগৃহীত হয় তা হল পরোক্ষ তথ্য। প্রত্যক্ষ তথ্য ক্ষেত্রসমীক্ষা একক বিশেষ সমীক্ষা বা নিরীক্ষা সূত্রে পাওয়া যায়। ক্ষেত্রসমীক্ষায় (Field research) অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ (Participant Observation) বিধিমুক্ত সাক্ষাৎকার (Informal interview) ব্যক্তিগত নথি-পত্র (Personal documents) প্রভৃতি সূত্রে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। নিরীক্ষা পদ্ধতিতে (survey research) সুগঠিত প্রশ্নমালার (Structured Questionnaire) সাহায্যে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই সাক্ষাৎকার প্রত্যক্ষ বা মুখোমুখি হতে পারে, অপ্রত্যক্ষভাবে যেমন দূরভাষ বা ডাকের মাধ্যমেও হতে পারে। ডাকের মাধ্যমে প্রশ্নমালা (Mailed Questionnaire) পাঠিয়ে উত্তর বা সংবাদ পাওয়া যেতে পারে। তথ্য সংগ্রহের উল্লিখিত পন্থা-পদ্ধতির মধ্যে যথার্থ পন্থা মনোনয়নের উপরই তথ্য সংগ্রহের যথার্থতা নির্ভর করে।

প্রাথমিক বা মূল উৎস (Primary Source) এবং গৌণ বা সহায়ক উৎস (Secondary Source): আমরা জানি যে গবেষণার ক্ষেত্রে উপাদান বা উপকরণ সংগ্রহ একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব, কারণ এই উপাদান বা তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই গবেষক নতুন কথা বলেন বা প্রচলিত মতামতের অপূর্ণতা বা ভ্রান্তি প্রমাণে প্রয়াসী হন। এই তথ্য সংগ্রহের উৎস সাধারণত দুই শ্রেণির হয়ে থাকে—প্রাথমিক বা মূল উৎস এবং গৌণ বা সহায়ক উৎস।

৫.২ : প্রাথমিক বা মূল উৎস (Primary Source)

নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রকৃত ও অবিকৃত তথ্যই প্রাথমিক উৎসরূপে বিবেচিত হয়। নাটক, উপন্যাস, গল্প, কবিতা, ডায়েরি, চিঠিপত্র, কথোপকথন, স্মৃতিচারণ, পরিসংখ্যানগত তথ্য ইত্যাদি এই শ্রেণির মধ্যে

পড়ে। প্রাথমিক উৎসের ক্ষেত্রে সাধারণত কোনো সম্পাদনা বা হস্তক্ষেপের অবকাশ থাকে না। যেমন শেকসপিয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটকটির ওপর যদি গবেষণা করা হয়, তবে সেই নাটকটি, তার একাধিক সংস্করণ, পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি—সবই মূল বা প্রাথমিক উৎসের পর্যায়ে পড়ে। ধরা যাক, কোনো গবেষকের গবেষণার বিষয়—'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রূপক-সাংকেতিক নাটক', সে ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলি ('ডাকঘর', 'রক্তকরবী', 'অচলায়তন', 'রাজা', 'মুক্তধারা', 'রথের রশি' ইত্যাদি) পর্যালোচনা তথা এই নাটকগুলি থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি হবে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও মূল তথ্য। তাই এই নাটকগুলিকে এ ক্ষেত্রে বলা চলে, প্রাথমিক বা মূল উৎস (primary source)। প্রাথমিক উৎস সহজলভ্য হলে গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষককে মূলত প্রাথমিক উৎসের ওপর নির্ভর করাই বিধেয়।

৫.৩ : সহায়ক বা গৌণ উৎস

অপর কোনো অনুসন্ধিৎসু পাঠক সমালোচক বা পণ্ডিত ব্যক্তি দ্বারা প্রাথমিক উৎস থেকে বিশ্লেষিত তথ্যই গৌণ উৎস বলে বিবেচিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ভার্জিলের 'ঈনীড' (Aeneid)—মহাকাব্যটি প্রাথমিক উৎস কিন্তু ডব্লিউ জ্যাকসন নাইটের 'রোমান ভার্জিল' (Roman Virgil) বা কেনেথ কুইনের 'ল্যাটিন একসপ্লোরেশনস্' (Latin Explorations) জাতীয় গ্রন্থ গৌণ উৎস রূপে চিহ্নিত হয়ে থাকে।

মূল উৎসের পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা গবেষণার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ লেখক তাঁর সাহিত্যকর্মেই প্রতিভাত হন, তাঁর রচনাতেই তাঁর উদ্দেশ্য (Authorial Intention) এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিবিম্বিত হয়। তাই মূল সাহিত্যকর্মের সঙ্গে গভীর ও প্রত্যক্ষ পরিচয় ব্যতীত সাহিত্যিক গবেষণার কাজ একেবারেই অসম্ভব।

মূল উৎস ব্যবহার করার সময় কয়েকটি কথা মনে রাখা অবশ্যই প্রয়োজন। যেমন গবেষকের পক্ষে লেখকের পাণ্ডুলিপিসহ গ্রন্থটির সমস্ত সংস্করণ, পাণ্ডুলিপির মধ্যে লেখককৃত পরিবর্তন/পরিবর্ধন/পরিমার্জনা ইত্যাদি সবই অনুসরণ করতে হবে। যেহেতু গবেষকের উচিত লেখকের রচনার বা মূলের এবং লেখকের অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্যের কাছাকাছি পৌঁছানো, তাই বিভিন্ন সংস্করণের আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে লেখকের জীবিতাবস্থায় প্রকাশিত শেষ সংস্করণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ ঔপন্যাসিক ফিল্ডিং-এর (Fielding) বিখ্যাত উপন্যাস 'টম জোনস্' (Tom Jones)-এর উল্লেখ করা যেতে পারে। ঔপন্যাসিকের জীবদ্দশায় এই উপন্যাসটির একাধিক সংস্করণ হয়েছিল এবং বিশেষ

কয়েকটি সংস্করণে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ও পরিবর্ধনও করা হয়েছিল। টম জোনস্ উপন্যাসটির ওপর গবেষণা করার সময় চূড়ান্ত গ্রহণযোগ্য (Authentic and Substantive edition) সংস্করণের সঙ্গে পূর্বের সংস্করণগুলির সঙ্গে বিশ্লেষণাত্মক তুলনা একান্ত প্রয়োজনীয়। শেক্সপিয়রের নাটকের ক্ষেত্রে মূল উৎস ব্যবহারের সমস্যা বহুস্তরী ও জটিল। প্রসঙ্গত বলা যায়, শেক্সপিয়র-গবেষকদের গোড়ার দিকের অনুসন্ধানগুলির মূল লক্ষ্য ছিল মুদ্রিত গ্রন্থের অব্যবহিত পশ্চাদবর্তী পাণ্ডুলিপির সমস্যার সমাধান করা।

অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় যে অনেক সাহিত্য-সমালোচকও ভাষাগত কারণে বা রচনাকে যুগোপযোগী করার উদ্দেশ্যে পুঁথির পাঠ পরিবর্তনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এক্ষেত্রে একজন প্রকৃত সাহিত্য-গবেষকের উচিত একটি নির্ভরযোগ্য (Reliable) পুঁথিকে মূল উৎস হিসাবে গ্রহণ ও অনুসরণ করা। অবশ্য পাঠান্তরগুলিকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং পাঠের বর্তমান রূপটি লেখককৃত কি না এ কথা যাচাই করে বিচার করতে হবে। আসল কথা হল—প্রচলিত গ্রন্থ বা Copy Text থাকা সত্ত্বেও ওই গ্রন্থেরই অন্য নির্ভরযোগ্য ও অভ্রান্ত সংস্করণ গবেষক অনুসরণ করবেন এবং এটিই তাঁর মূল উৎস হবে। সঠিকভাবে মূল উৎস চিহ্নিত করা এবং একটি নির্ভরযোগ্য সংস্করণ নির্ণয় করার কাজটি বড়ই দুরূহ। মধ্যযুগীয় প্রাচীন গ্রন্থকার ও গবেষকদের মূল উৎস সংক্রান্ত সমস্যা স্বাভাবিক কারণেই জটিল।

সার্থক ও আদর্শ গবেষণা তার মূল উৎসের ওপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে থাকে। এই কারণে এমন এক সংস্করণ ব্যবহার করা প্রয়োজন যেটি লেখকের অভিপ্রেত বক্তব্যের সবচেয়ে কাছাকাছি, দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন সংস্করণের পাঠান্তর (Variant Reading: Substantive and Derivative Reading) বিচার, গ্রহণযোগ্য কপিটেক্সটের (Copy-Text) কোনো সংস্করণ না করাই কাম্য। তৃতীয়ত, মূল গ্রন্থটি সঠিক কিনা, বিভিন্ন প্রমাণ সাপেক্ষে তারও প্রামাণিকতা বিচার, চতুর্থত, বিভিন্ন পাঠান্তর ও সংস্করণের মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা এবং পরিশেষে, গবেষকের সাহিত্যিক অনুসন্ধিৎসা-বোধের সমন্বয়, সামাজিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বক্তব্যের গুরুত্ব প্রতিপাদন।

গবেষণার কাজে মূল উৎস বা প্রাথমিক উৎসের মতো গৌণ বা সহায়ক উৎসও অবশ্য সমান গুরুত্বপূর্ণ। গৌণ উৎস বলতে বোঝায় মূল উৎস সংক্রান্ত সমালোচনামূলক গ্রন্থ ও তথ্যসমূহ। যেমন রবীন্দ্রনাথের কবিতার ওপর যাবতীয় সাহিত্য সমালোচনামূলক গ্রন্থই গৌণ উৎসের উদাহরণ। গৌণ উৎস ব্যবহারের ক্ষেত্রেও গবেষকের উচিত ব্যক্তিগত চাহিদা ও প্রাসঙ্গিকতা অনুযায়ী গ্রন্থের নির্বাচন ও বিচার করা। মনে রাখতে হবে, গবেষকের কাছে পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিরও মূল্য আছে।

গৌণ উৎসের মধ্যে কেবলমাত্র সাহিত্য-সমালোচনামূলক গ্রন্থই পড়ে না, সাহিত্যের ইতিহাস, ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা, লেখকের অন্যান্য সাহিত্যকর্ম, তাঁর জীবনী ইত্যাদি গবেষকের পক্ষে সহায়ক। আবার অনেক সময় ভাষাতত্ত্বের সহায়তা গ্রহণও প্রয়োজন হতে পারে, অর্থাৎ গবেষণার জন্যে ব্যাপক ও বিস্তৃণ গৌণ উৎসের সহায়তা প্রয়োজন।

এছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সাহিত্যগ্রন্থ, সাহিত্যের প্রবণতা বা সাহিত্য আন্দোলন সম্পর্কিত মূলবান সুচিন্তিত মতামত, মূল্যায়ন ইত্যাদি গৌণ উৎসের মধ্যে পড়ে। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে কোনো গ্রন্থ ও তার গ্রন্থকার সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়, এই সব তথ্যও গবেষকের পক্ষে অপরিহার্য উপকরণ—যেমন আধুনিক কাব্যের নতুন ধারা আলোচনা প্রসঙ্গে 'প্রগতি', 'পরিচয়' পত্রিকার উল্লেখ অপরিহার্য। আবার ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, দর্শন সংক্রান্ত নানা গ্রন্থও গৌণ উৎসের মধ্যে পড়ে। যেমন—ভার্জিনিয়া উল্‌ফ বা জেমস্ জয়েসের উপন্যাস সম্পর্কে গবেষণা করতে গেলে অবশ্যই সমকালীন রাজনৈতিক/ঐতিহাসিক/সামাজিক প্রেক্ষাপটে অথবা বার্নাড শ-এর নাটকের ওপর গবেষণা করতে গেলে তৎকালীন রাজনীতি ও রাজনৈতিক ধ্যানধারণা সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। বামপন্থী কবিদের সম্পর্কে গবেষণার কাজে অথবা স্টিফেন স্পেন্ডার বা ডবলিউ, এইচ. অডেন সম্পর্কে গবেষণাত্মক আলোচনা করতে গেলে যুদ্ধকালীন পটভূমিকা সম্পর্কে বিস্তর অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে এই বিষয় সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক গ্রন্থগুলি গৌণ উৎসের পর্যায়ে পড়ে। ক্ষেত্রবিশেষে, সাহিত্য গবেষকের পক্ষে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণের অনুসন্ধানও আবশ্যক হতে পারে।

অনেকসময় গৌণ উৎসকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে---একদিকে রয়েছে সাহিত্য-সমালোচনামূলক বা সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থাবলি এবং অপরদিকে সাহিত্য ছাড়া অন্যান্য বিষয়ক গ্রন্থ। কিন্তু এই শ্রেণিবিভাগ সর্বদা গ্রহণযোগ্য হয় না, কারণ আন্তঃসম্পর্কিত গ্রন্থের সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য নয়। গৌণ উৎস ব্যাপক ও বিচিত্র এবং গবেষকের দৃষ্টিতে কোন গ্রন্থ এই পর্যায়ে পড়বে, তা নির্ভর করে মূল উৎস অর্থাৎ গবেষণার মূল বিষয়ের ওপর।

প্রাথমিক বা মূল উৎস এবং গৌণ বা সহায়ক উৎস এই দুই ধরনের উৎস থেকেই তথ্য সংগ্রহের কাজ হওয়া উচিত ব্যাপক, যুক্তিনিষ্ঠ ও সামগ্রিক। তথ্য সংগ্রহ বা তথ্য উপস্থাপনা নয়। প্রয়োজন তথ্য বিশ্লেষণের এবং তথ্যের ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এবং এর জন্য প্রয়োজন, যুক্তিনিষ্ঠা, বৈজ্ঞানিক, বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি, প্রকৃত সাহিত্যবোধ এবং সর্বোপরি, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী ক্ষমতা।

তবে গবেষণার ক্ষেত্রে বিশ্লেষণই যথেষ্ট নয়, চূড়ান্ত পর্যায়ে সংশ্লেষণেরও প্রয়োজন আছে। বিশ্লেষণ অর্থাৎ অনুপুঙ্খ 'ভেঙে' ভাগ করে বিচার করা এবং এই পৃথক পৃথক উপাদানের সমন্বিত যুক্তিসিদ্ধ একত্রীকরণ হল সংশ্লেষণ। তথ্য সংগ্রহ গবেষণার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রয়োজনীয় বিষয়, কিন্তু এর যথাযথ সন্নিবেশ ছাড়া গবেষণা সার্থক হয় না। তাই একদিকে যেমন ঠিকভাবে তথ্য বিশ্লেষণ করতে হয়, অপরদিকে তার উপযুক্ত সংশ্লেষণ অর্থাৎ তথ্যের পৃথক উপাদানগুলিকে যুক্তিসিদ্ধ সমন্বিত করারও প্রয়োজন আছে।

৫.৪ : তথ্যের শ্রেণিকরণ, বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা প্রদান

তথ্য বিশ্লেষণ করে, সুনির্দিষ্ট তত্ত্বভাবনার আলোকে, ব্যাখ্যা প্রদান করা গবেষণার অন্যতম প্রধান কাজ। সঠিক অর্থে গবেষকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যার ভিতর দিয়েই উঠে আসে। তবে তথ্যের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার আগে তথ্যের শ্রেণিকরণ/ট্যাবুলেশন ইত্যাদি কাজ করে নিতে হয়। গবেষণাকর্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বিশ্লেষণ। এটি Core Issues of Research-এর অপরিহার্য অংশ। বিশ্লেষণ বলতে Analysis এবং Interpretation—দুটোই বোঝানো হয়। পূর্ববর্তী তথ্য পর্যালোচনা করে, গবেষকের নিজস্ব সংগৃহীত তথ্যের ওপর নির্ভর করে অথবা কোন তাত্ত্বিক আদলকে সামনে রেখে একজন গবেষক নতুনভাবে বিশ্লেষণ করবেন বা নতুন চিন্তাকে তুলে ধরবেন। গবেষণার বিশ্লেষণ অংশে এই সব মৌলিকতার দিক ধরা থাকে। বিশ্লেষণ অংশ এবং সিদ্ধান্তের মধ্যেই গবেষকের চিন্তার নির্যাসটুক ধরা পড়ে। বিশ্লেষণ অংশ গবেষণাসন্দর্ভে না থাকলে, তা কোন মৌলিক গবেষণা বলে গণ্যই হবে না।

এখন কথা হল 'বিশ্লেষণ' অংশটি গবেষণাসন্দর্ভে কী ভাবে থাকবে, তা গবেষক নিজেই স্থির করবেন। তবে বিশ্লেষণ দু-ভাবে করা যেতে পারে—

অধ্যায়ভিত্তিক বিশ্লেষণ (Chapterwise Analysis)

সামগ্রিক বিশ্লেষণ (Overall Analysis)

প্রত্যেকটি অধ্যায়ের শেষে, সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের বিশ্লেষণ থাকলে তাকে 'অধ্যায়ভিত্তিক বিশ্লেষণ' (Chapterwise Analysis) বলা যেতে পারে (দৃষ্টান্ত-এক)।

অন্যদিকে, সবকটি অধ্যায়ের শেষে সার্বিকভাবে বিশ্লেষণ করা থাকলে তাকে 'সামগ্রিক বিশ্লেষণ' (Overall Analysis) বলা যেতে পারে (দৃষ্টান্ত-দুই)।

এখানে দুটি উদাহরণের মধ্যে দিয়ে দ্বিবিধ বিশ্লেষণের গঠন প্রদর্শন করা হল।

দৃষ্টান্ত এক : অধ্যায়ভিত্তিক বিশ্লেষণ

দ্বিতীয় অধ্যায় : বাংলা ছড়ায় জাদু

তৃতীয় অধ্যায় : বাংলা প্রবাদে জাদু

প্রাপ্ত তথ্য

বিশ্লেষণ

দৃষ্টান্ত দুই : সামগ্রিক বিশ্লেষণ

দ্বিতীয় অধ্যায় : বাংলা ছড়ায় জাদু

তৃতীয় অধ্যায় : বাংলা প্রবাদে জাদু

চতুর্থ অধ্যায় : বাংলা লোকগানে জাদু

পঞ্চম অধ্যায় : বাংলা লোকগল্পে জাদু

ষষ্ঠ অধ্যায় : সামগ্রিক বিশ্লেষণ

সপ্তম অধ্যায় : উপসংহার

দ্বিবিধ প্রকার বিশ্লেষণ ভঙ্গীর পার্থক্যের আদল, নিচে প্রদর্শন করা হল—

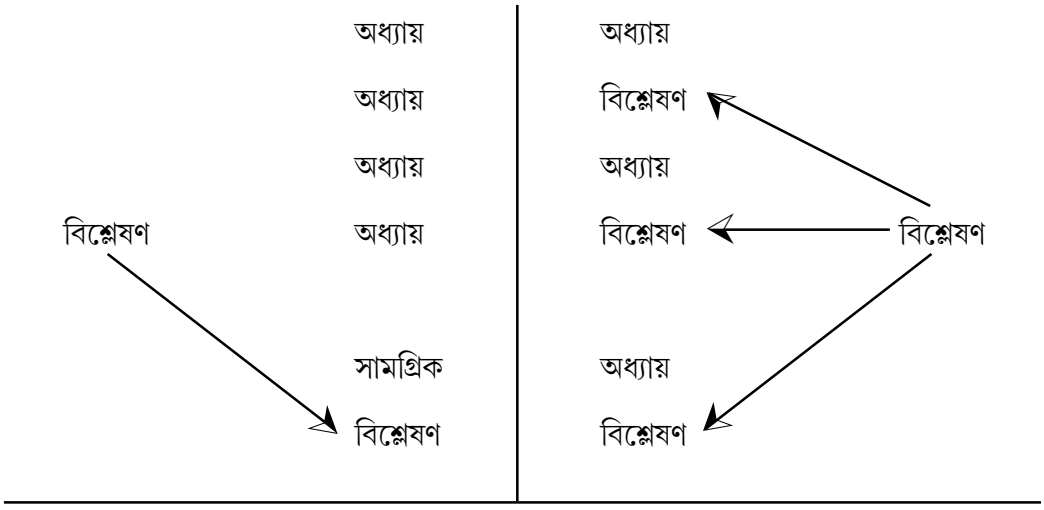

সামগ্রিক বিশ্লেষণ অধ্যায়ভিত্তিক বিশ্লেষণ

৫.৫ : তথ্যঋণ

১) গবেষণাপত্র অনুসন্ধান ও রচনা, জগমোহন মুখোপাধ্যায়, ১ম ই-বুক সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২০।

২) গবেষণার তত্ত্বতালাশ : শ্রাবণী পাল, বেলা দাস (সম্পা), প্রথম সংস্করণ, পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ডিসেম্বর ২০২১।

৩) গবেষণা : প্রকরণ ও পদ্ধতি, সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩য় সংস্করণ, দেজ পাবলিশিং, জুলাই ২০০৫।

৪) গবেষণার পদ্ধতি বিজ্ঞান—সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি : শেখ মকবুল ইসলাম। প্রথম প্রকাশ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। ডিসেম্বর, ২০১২।

৫) সামাজিক গবেষণা : পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া, কৃষ্ণদাস চট্টোপাধ্যায়, ৩য় সংস্করণ, আরামবাগ বুক হাউস, সেপ্টেম্বর ২০০৫।

৫.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। গবেষণা সন্দর্ভ রচনার বিভিন্ন স্তরগুলির সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করো।

২। গবেষণা কর্মে তথ্যসংগ্রহ ও তথ্য বিশ্লেষণ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করো।

৩। গবেষণা বলতে কী বোঝায়? গবেষণা কত ধরণের হতে পারে তা দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করো।

৪। গবেষণা কর্মে লেখ্যগার, গ্রন্থগার, সংগ্রহালয়—এই তিন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করো।

একক - ৬

গবেষণার উৎস-নির্দেশ পদ্ধতি

বিন্যাস ক্রম :

৬.১ : সূত্রনির্দেশ

৬.২ : টীকা

৬.৩ : গ্রন্থপঞ্জি

৬.৪ : পরিশিষ্ট

৬.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৬.১ : সূত্রনির্দেশ

গবেষণা-মূলক কোনো রচনায় নিজের বক্তব্যের যুক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করতে, তথ্যের সম্পূর্ণতার উদ্দেশ্যে, বা তথ্যের অন্তর্নিহিত ভাবটিকে সম্প্রসারিত করতে অন্যান্য লেখকের প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত রচনা, চিঠিপত্র কিংবা সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃতি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। উদ্ধৃতি প্রয়োগ অবশ্যই বিচক্ষণতার সঙ্গে করা উচিত, অপ্রয়োজনীয় প্রয়োগ কখনোই বাঞ্ছনীয় নয়।

উদ্ধৃতি প্রয়োগ মূলত দুই প্রকারের প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতি ও পরোক্ষ উদ্ধৃতি। প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতিতে মূল রচনার কোনো পঙ্‌ক্তি বা অনুচ্ছেদ প্রত্যক্ষত উদ্ধার করা হয় গবেষণাপত্রে।

- প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতি ব্যবহারের সময় মূল রচনার বানান, বিরাম-চিহ্ন, অনুচ্ছেদ সব কিছুরই হুবহু প্রতিলিপিকরণ প্রয়োজন। এমনকী, মূল গ্রন্থের থেকে উদ্ধৃত অংশে কোনো ভুল থাকলে সেটি সংশোধন করাও নীতিবিরুদ্ধ বলেই মনে করা হয়।
- প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতি নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ এর অতিব্যবহার পাঠককে রচনার মূল বক্তব্য থেকে বিচ্যুত করে। একই কারণে প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতি অতিদীর্ঘ হওয়াও বাঞ্ছনীয় নয়।

- প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতি ব্যবহারের নিয়ম হল:

  ১. গদ্য উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে তিন লাইন বা পঞ্চাশ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতি মূলপাঠের মধ্যেই উর্ধকমাবদ্ধ করে ব্যবহার করা যায়। কবিতার উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে একই ভাবে দুই বা তিন পঙ্‌ক্তি পর্যন্ত উদ্ধৃতি মূল পাঠের মধ্যেই উর্ধকমাবদ্ধ করে ব্যবহার, পঙ্‌ক্তিগুলি তির্যক চিহ্ন দ্বারা পৃথক করা হয়।

  ২. গদ্য বা কবিতার ক্ষেত্রে দীর্ঘতর উদ্ধৃতি মূলপাঠের পর কোলন চিহ্ন দিয়ে পৃথকভাবে সন্নিবিষ্ট হয়। গদ্যের ক্ষেত্রে পৃথক অনুচ্ছেদরূপে বাম মার্জিন থেকে তিন হরফ পরিমাণ স্থান ছাড় দিয়ে সন্নিবেশনের নিয়ম, কবিতার ক্ষেত্রে পৃষ্ঠার মাঝামাঝি অংশে সন্নিবিষ্ট করা হয় উদ্ধৃত কবিতার আকার মূল কবিতার অনুরূপ থাকা বাঞ্ছনীয়। মূলপাঠ থেকে পৃথকভাবে উদ্ধৃত হলে গদ্য বা কবিতার উদ্ধৃতি উদ্ধার-চিহ্ন বা উর্ধকমাবদ্ধ করা হয় না।

প্রত্যক্ষত অন্য কোনো লেখকের রচনা উদ্ধৃত না করে যদি তাঁর বক্তব্যের সারার্থ নিজের ভাষায় মূল পাঠে অন্তর্ভুক্ত করলে তাকে পরোক্ষ উদ্ধৃতি বলা হয়। এতে উর্ধকমার কোনো প্রয়োগ হয় না।

গবেষণামূলক রচনায় ভিন্ন রচনা থেকে সংগৃহীত যে উদ্ধৃতি সেগুলির যে প্রমাণ-পঞ্জি নির্মাণের পদ্ধতি, তাই হল সূত্রনির্দেশ, আর এর মাধ্যমে নির্মিত হয় তথ্যসূত্র। উৎস নির্দেশের কয়েকটি রীতি আছে, যেমন

1. Indian Standard
2. American Psychological Association Standard ŒAPA Style ManualŠ
3. American Anthropological Style Guide
4. American Sociological Association Style Guide
5. Harvard Style Guide
6. Chicago Style Manual
7. Modern Language Association ŒMLA Style GuideŠ ইত্যাদি।

উৎস নির্দেশের ক্ষেত্রে প্রদেয় তথ্যগুলিকে পাঁচভাগে ভাগ করা হয়

ক. গ্রন্থকারগ্রন্থ বা প্রবন্ধ যেটি থেকে উদ্ধৃতি গৃহীত হয়েছে তার লেখকের নাম উল্লেখ্য।

খ. শিরোনামগ্রন্থ বা প্রবন্ধের শিরোনাম, সংকলন থেকে গৃহীত প্রবন্ধের শিরোনামের পর মূল গ্রন্থের সম্পাদক বা সংকলকের নাম এবং মূল গ্রন্থের শিরোনাম।

গ. সংস্করণ তথ্যগ্রন্থের একাধিক সংস্করণ থাকলে যে সংস্করণ থেকে উদ্ধৃতি গৃহীত সেটি উল্লেখ করতে হয়।

ঘ. প্রকাশন তথ্যপ্রকাশ স্থান, প্রকাশক এবং প্রকাশকাল উল্লেখ্য।

ঙ. পৃষ্ঠাঙ্ক—যে পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত হয়েছে সেই পৃষ্ঠা সংখ্যাটি উল্লেখ করতে হবে।

উদাহরণ:

নীহাররঞ্জন রায়, 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা', ৫ম সং, কলকাতা, নিউ এজ, ১৯৬২, পৃ ৩৪

তথ্যসমীক্ষা:

সাধারণত গবেষণার জন্য তথ্যসংগ্রহের সময় তিন ধরণের উৎস থেকে গৃহীত হয় তথ্য। প্রথমত, প্রাথমিক উৎস বা প্রাইমারি সোর্স কোনো লেখকের নিজের লেখা গ্রন্থের কোনো উদ্ধৃতি যা গবেষণাপত্রে গৃহীত হচ্ছে; দ্বিতীয়ত, গৌণ উৎস বা সেকেন্ডারি সোর্স ওই লেখকের উদ্ধৃতি যা অন্য কোন গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে এবং গবেষণাপত্রে ওই উৎস থেকে গৃহীত হলে; তৃতীয়ত, টারসিয়ারি সোর্সগৌণ উৎসের গ্রন্থটি থেকে যদি অন্য কোন গ্রন্থে উদ্ধৃতিটি সন্নিবিষ্ট হয় এবং সেখান থেকে যদি গবেষণাপত্রে উদ্ধৃতিটি গৃহীত হয়। ক্রমান্বয়ে উৎসগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা কমতে থাকে।

৬.২ : টীকা

গবেষণার কাজে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে টীকা-টিপ্পনি সংযুক্ত করতে হয়। মূলপাঠে উল্লিখিত কোন বিশেষ প্রসঙ্গের বিশদ বিবরণ, দীর্ঘ ব্যাখ্যা, ব্যক্তি-পরিচিতি, উদ্ধৃতির অনুবাদ প্রভৃতি, যেগুলি গবেষণাপত্রটিকে সম্পূর্ণতর ও পাঠকের কৌতূহলকে নিবৃত্ত করবে, সেগুলি টীকা শিরোনামে সংযুক্ত করা হয়। সাধারণত দুইভাবে টীকা করা হয়—১. পাদটীকা, ২. অন্ত্যটীকা। পাদটীকা প্রত্যেকটি পৃষ্ঠার নিচে সন্নিবিষ্ট হয়, অন্ত্যটীকা থাকে সমগ্র প্রবন্ধের শেষে অথবা গবেষণাপত্রের প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে। সাধারণত বইতে পাদটীকা এবং গবেষণা সন্দর্ভে অন্ত্যটীকার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

৬.৩ : গ্রন্থপঞ্জি

গবেষণার কাজে যেসব প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত উৎস থেকে উপাদান সংগ্রহ করা হয় সেগুলির সম্পূর্ণ পরিচায়ক তথ্যসহ তালিকা গ্রন্থপঞ্জি নামে চিহ্নিত করা হয়। গবেষণার কাজে একাধিক ভাষার গ্রন্থ বা

প্রবন্ধ ব্যবহৃত হলে ভাষা-ভিত্তিক পৃথক গ্রন্থপঞ্জি নির্মাণ করা বাঞ্ছনীয় এবং যে ভাষায় গবেষণাপত্রটি লিখিত সেই ভাষার গ্রন্থপঞ্জি সর্বপ্রথমে সংযুক্ত করা নিয়ম।

- তথ্যসূত্রে উৎসগ্রন্থ পরিচায়ক তথ্যের মূল বিভাগগুলি কমা-দ্বারা পৃথক করা হয়, গ্রন্থপঞ্জিতে বিভাগগুলি পূর্ণচ্ছেদ বা দাঁড়ি দ্বারা পৃথকীকরণ করা হয় কেবল গ্রন্থের সংস্করণ তথ্যগুলিকে একটি পৃথক বিভাগ রূপে গণ্য করা হয় বলে একত্রে প্রকাশস্থান, প্রকাশক ও প্রকাশকাল তিনটি তথ্য কমা দিয়ে লেখা হয় এবং একত্রে দাঁড়ি দ্বারা পৃথকীকৃত হয়।
- পৃষ্ঠা সংখ্যার উল্লেখ গ্রন্থপঞ্জিতে প্রয়োজনীয় নয়।
- গ্রন্থপঞ্জিতে একটি গ্রন্থ একবারই উল্লিখিত হবে, তথ্যসূত্রে প্রয়োজনানুসারে একটি গ্রন্থ একাধিকবার উল্লিখিত হতে পারে, তবে সেই উল্লেখ সংক্ষিপ্ত আকারে ঘটবে।
- তথ্যসূত্রে গ্রন্থগুলি উৎসসূচক সংখ্যার অনুক্রমে সংযোগ করা হয়। গ্রন্থপঞ্জিতে গ্রন্থগুলি গ্রন্থকারের নামের বর্ণানুক্রমে তালিকাভুক্ত করা হয়ে থাকে।

উদাহরণ:

নীহাররঞ্জন রায়। ‘রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা’। ৫ম সং। কলকাতা, নিউ এজ, ১৯৬২।

পত্রিকা-পঞ্জি:

গ্রন্থের মতোই পত্রিকা থেকে সংগৃহীত প্রবন্ধ বা কবিতারও গ্রন্থপঞ্জি নির্মিত হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে উৎস নির্দেশে প্রদেয় তথ্যগুলির ক্রম পরিবর্তিত হয়ে যায়, যথা

প্রবন্ধ বা কবিতার রচয়িতার নাম

রচনার শিরোনাম(উদ্ধার চিহ্নবদ্ধ বা ডবল কোটেশন চিহ্ন)

মূল পত্রিকার শিরোনাম(উর্ধকমাবদ্ধ বা সিঙ্গল কোটেশন চিহ্ন)

পত্রিকার প্রকাশন তথ্য(বর্ষ, সংখ্যা, প্রকাশন তারিখ)

তথ্যের অবস্থান তথা পৃষ্ঠা সংখ্যা

উদাহরণ:

গৌতম নিয়োগী। “রবীন্দ্র চর্চায় পৌলীন্য”। ‘দেশ’ ১৭ নভেম্বর ১৯৮৪, পৃ ১৬-১৮।

৬.৪ : পরিশিষ্ট

কোন তথ্যের বিস্তৃততর ব্যাখ্যা, দীর্ঘতর উদ্ধৃতি, মূলপাঠে উল্লিখিত কোন দলিল বা তার অংশ বিশেষ, আইনের মূলপাঠ, গবেষণা সংক্রান্ত কোন সমীক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রশ্নপত্র বা সারণি যেগুলি গবেষণার সঙ্গে সংযুক্ত হলেও মূলপাঠের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা যায় না, অথচ পরীক্ষকের জ্ঞাতার্থে অথবা আগ্রহী পাঠককে সম্পূর্ণতর তথ্যজ্ঞাপনের জন্য উদ্ধার করা প্রয়োজন, সেগুলিই 'পরিশিষ্ট' শিরোনামাঙ্কিত অংশে সংযুক্ত করা হয়।

চিত্র বা অন্যান্য নথি প্রদান:

গবেষণার বিষয়টিকে বিশদভাবে উপস্থাপিত করতে অনেক সময় চিত্র, সারণি, নক্সা, মানচিত্র প্রভৃতি গবেষণা সন্দর্ভের সঙ্গে সংযুক্ত করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। চিত্র বা সারণি মূলপাঠের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি আলোচনার নিকটতম পৃষ্ঠায় অথবা স্থানাভাবে মূলপাঠের শেষ পরিচ্ছেদের পর একত্রে সংযুক্ত করা বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি চিত্র, সারণি বা নথিকে সংখ্যা বা সংকেত দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে এবং মূলপাঠে আলোচনার সঙ্গে সেগুলির উল্লেখ করতে হবে। অন্যান্য নথি ও চিত্রের পাদদেশে এবং সারণির শীর্ষদেশে তাদের পরিচায়ক তথ্য যোগ করা বাধ্যতামূলক।

৬.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। গবেষণা কর্মে গবেষণার উৎস-নির্দেশ পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করো।

২। গবেষণা কর্মে উদ্ধৃতি প্রয়োগের কারণ কি? উদ্ধৃতি প্রয়োগে বক্রলেখ, স্থান সংক্ষেপ প্রক্রিয়া সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

৩। গবেষণা সন্দর্ভে গ্রন্থপঞ্জি, পত্রপঞ্জি, চিত্রপঞ্জি এবং অন্যান্য তথ্যপঞ্জি ব্যবহারের রীতি-নীতিগুলির পরিচয় দিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির গুরুত্ব নিরূপণ করো।

একক - ৭

ক্ষেত্রসমীক্ষা

বিন্যাস ক্রম :

৭.১ : ভূমিকা

৭.২ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৭.৩ : প্রশ্নাবলী

৭.১ : ভূমিকা

তথ্য সংগ্রহের ওপর নির্ভর করে গবেষণার মৌলিকত্ব। আবার তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রসমীক্ষার প্রভূত গুরুত্ব রয়েছে। কোন কোন গবেষণার মূল ভিত্তিই হয় এই ক্ষেত্রসমীক্ষা। গবেষণার স্বাতন্ত্র বজায় রাখার জন্য অবশ্যই প্রয়োজনানুসারে ক্ষেত্রসমীক্ষা করা জরুরি।

উভয়ের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে তথ্যকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রাথমিক তথ্য (Primary Data) ও মাধ্যমিক তথ্য (Secondary Data)। প্রাথমিক তথ্য মানে হল যে তথ্য স্বাধীন অনুসন্ধানের মাধ্যমে সরাসরি উৎস থেকে সংগৃহীত হয়। বোঝাই যাচ্ছে এই প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য ক্ষেত্রসমীক্ষা খুবই প্রয়োজনীয়। প্রকৃতপক্ষে সরাসরি ক্ষেত্র (Field) পর্যায়ে তথ্য সংগৃহীত হলে তা হয় প্রাথমিক তথ্য এবং এই তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়াই ক্ষেত্রসমীক্ষা। এই প্রক্রিয়ায় গবেষকরা সরাসরি তাঁর গবেষণার প্রয়োজন অনুসারে কোন গ্রাম বা কোন অঞ্চলে গিয়ে সরাসরি মানুষের সাথে কথা বলে তথ্য সংগ্রহ করেন।

এই তথ্য সংগ্রহের আবার নানা পদ্ধতি আছে। যেমন—পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (Observation Method), সাক্ষাৎকার পদ্ধতি (Interview Method), প্রশ্নমালা পদ্ধতি (Ouestionnaire Method), দ্রুত গ্রামীণ বা পৌর মূল্যায়ন (Rapid Rural or Urban Appraisal), অভিক্ষেপন পদ্ধতি (Projective Technique) ইত্যাদি। গবেষক তাঁর গবেষণা অনুযায়ী এই পদ্ধতিগুলির মধ্যে যেকোন একটি বা একের বেশি পদ্ধতি আরোপ করতে পারেন।

এইগুলি হল প্রাথমিক পর্যায়। এবার বিশেষভাবে ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য কিছু পদ্ধতি রয়েছে। যেগুলো তথ্য সংগ্রহের জন্য সরাসরি সমীক্ষার এলাকায় গিয়ে গবেষককে প্রয়োগ করতে হয়। ক্ষেত্রসমীক্ষার এই পদ্ধতি আবার পাঁচ প্রকার হয়ে থাকে। যেমন—প্রাথমিক প্রক্রিয়া, মানচিত্রাংকন, ভূমিতিক পর্যবেক্ষণ, তথ্য লিপিবদ্ধ করণ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ।

এর মধ্যে প্রাথমিক প্রক্রিয়া বলতে বোঝায় গবেষণার উদ্দেশ্য বর্ণন, প্রাথমিক অনুসন্ধান, প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ, এলাকা পরিকল্পনা, সেই এলাকার মানচিত্র তৈরি ইত্যাদি। মানচিত্রাংকনের ক্ষেত্রে সমীক্ষার জন্য চিহ্নিত ক্ষেত্রটির মানচিত্র আঁকতে হবে, ভূমিতিক পর্যবেক্ষণের মধ্যে পরে কিভাবে পরিকল্পনা করা হচ্ছে সেই বিষয়টি। তথ্য লিপিবদ্ধকরণের মধ্যে পরে কিভাবে সংগৃহীত তথ্য লেখা হচ্ছে সেই মূল্যবান বিষয়টি। এখানে বর্ণনাত্মক লেখার পাশাপাশি, রেখচিত্র অঙ্কন, চিত্রাংকন, আলোকচিত্র গ্রহণ ইত্যাদি করা হয়। সাক্ষাৎকার গ্রহণ ক্ষেত্রসমীক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তারও নানারকম পদ্ধতি আছে। যেমন—প্রশ্নমালা ভিত্তিক সাক্ষাৎকার, অনির্ধারিত সাক্ষাৎকার ইত্যাদি।

ক্ষেত্রসমীক্ষার পরবর্তী পদক্ষেপটি হচ্ছে নমুনা সংগ্রহ। উপরিউক্ত পদ্ধতির সাহায্যে গবেষণা কার্যের জন্য নমুনা সংগ্রহ করে রাখা হয়। এই গবেষণাকে বৈজ্ঞানিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই পদ্ধতি যত নির্ভুল হবে তত বেশি গবেষণার অগ্রগতি ঘটবে।

প্রশ্নমালা তৈরিরও অনেক পদ্ধতি আছে। তার আছে নানা প্রকারভেদও। যেমন—সংগঠিত প্রশ্নমালা, অসংগঠিত প্রশ্নমালা, আবদ্ধ প্রশ্নমালা, উন্মুক্ত প্রশ্নমালা ইত্যাদি। প্রশ্নমালা তৈরির ক্ষেত্রে গঠন কাঠামো নির্মাণ, প্রশ্নমালা সম্পাদন ইত্যাদি সচেতনভাবে করতে হবে। কি ধরণের তথ্য সংগৃহীত হবে সেই হিসেবে একটি খসড়া প্রশ্নমালা তৈরি করতে হবে। বারবার পরীক্ষা ও পুনর্বিচার করে দেখতে হবে সেগুলি যথার্থ হয়েছে কিনা। প্রশ্নের ভাষা এবং উত্তরদাতার বোধগম্যতা এ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এগুলি সবই প্রশ্নের গঠনের মধ্যে পড়ে। প্রশ্নমালা সম্পাদন করতে গেলে নজর দিতে হয় প্রশ্নের বিষয়, আকৃতি, শব্দচয়ন ইত্যাদির ওপরে। সর্বোপরি প্রশ্নমালা তৈরির সময় কতকগুলি বিষয়ে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হয়। যেমন, প্রশ্নের ভাষা হবে সহজ, সরল, প্রশ্নকর্তাকে হতে হবে নম্র, বিনয়ী। অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন বাদ দিতে হবে, কোনভাবেই উত্তরদাতা যেন প্রশ্নের দ্বারা বিব্রত বা আঘাতপ্রাপ্ত না হয় সেদিকে নজর দিতে হবে। সবরকমের সমালোচনা থেকে বিরত থাকতে হবে। নজর রাখতে হবে প্রশ্নের যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, প্রশ্ন যেন বিষয়ানুসারী হয় ইত্যাদি।

এই প্রশ্নমালা তৈরি এবং সম্পাদনের দ্বারা যেটি করা হয় সেটি হল সাক্ষাৎকার গ্রহণ। মৌখিক কথাবার্তার মধ্যে তথ্যের আদান প্রদান হয়। পাশাপাশি সাক্ষাৎপ্রদানকারীর পোশাক-পরিচ্ছদ, পরিবেশ, আচার-আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যক্তিত্ব বিষয়েও সম্যক ধারণা তৈরি হয়। সাক্ষাৎকার রেকর্ড বা লিপিবদ্ধ করা দুরকমই হতে পারে। কাঠামোগত সাক্ষাৎকার, কাঠামোহীন সাক্ষাৎকার, ক্লিনিক্যাল সাক্ষাৎকার ইত্যাদি সাক্ষাৎকারের নানা প্রকার ভেদ রয়েছে। সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রেও কতগুলি নিয়ম মানতে হবে। যেমন সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে সৎ ও নিষ্ঠাবান থাকতে হবে নিজের কাজের প্রতি। তাকে অবশ্যই যোগ্য হতে হবে প্রশ্ন করা, উত্তর লিপিবদ্ধ করা এবং গবেষণার কাজে তা যথাযথ ব্যবহার করার জন্য। তাকে অবশ্যই পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে হবে। তাকে মার্জিত ও রুচিশীল ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হবে যাতে সাক্ষাৎপ্রদানকারীর সাথে একটি সুন্দর সম্পর্ক তৈরি হয়। সাক্ষাৎগ্রহণকারীর অবশ্যই উপস্থিত বুদ্ধি, ভাষার প্রতি দক্ষতা থাকতে হবে। সর্বোপরি কিভাবে গবেষণার বিষয়ানুসারে তথ্য সংগ্রহ করা যায় সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রস্তুতি ও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

এছাড়াও রয়েছে পর্যবেক্ষণ। ক্ষেত্রসমীক্ষার ক্ষেত্রে এটিও একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ধাপ। এতে পুরো বিষয়টির একটি সামগ্রিক চিত্র উঠে আসে। পর্যবেক্ষণ করার ক্ষেত্রে পূর্বপ্রস্তুতি, বস্তুনিষ্ঠতা ইত্যাদির ওপর জোর দেওয়া হয়। পর্যবেক্ষণকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থেকে গবেষণাকর্মকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়।

উপরিউক্ত বিষয়গুলিকে মাথায় রেখে ক্ষেত্রসমীক্ষা করলে তা গবেষণার জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে।

৭.২ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। গবেষণার তত্ত্বতালাশ : সম্পাদনায় শ্রাবণী পাল, বেলা দাস। পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড। ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা ৭০০০০৯। প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০২১।

২। গবেষণার পদ্ধতি বিজ্ঞান সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি : শেখ মকবুল ইসলাম। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯। প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর, ২০১২।

৭.৩ : প্রশ্নাবলী

ক। ক্ষেত্রসমীক্ষা বলতে কি বোঝ? ক্ষেত্র সমীক্ষার পদ্ধতিগুলি আলোচনা করো।

খ। গবেষণার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রসমীক্ষার প্রয়োজনীয়তা লিপিবদ্ধ করো।

একক - ৮

প্রকল্পরচনার খুঁটিনাটি (Time Management and Resposibilities in all sector), টাইপ, প্রুফ সংশোধন ও এডিটিং

বিন্যাস ক্রম :

৮.১ : ভূমিকা

৮.২ : সময়ের ব্যবস্থাপনা

৮.৩ : গবেষকের দায়িত্ব

৮.৪ : গবেষণাপত্র টাইপ ও প্রুফ সংশোধন

৮.৫ : এডিটিং

৮.৬ : উপসংহার

৮.৭ আদর্শ প্রশ্ন

৮.৮ সহায়ক গ্রন্থ

৮.১ : ভূমিকা

গবেষণা কোনো সাধারণ কাজ নয়, এটি একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে উপস্থাপন করতে হয়। তাই গবেষণা করার শুরুতেই সেই কর্মটির গুরুত্ব সম্পর্কে জেনে নেওয়া উচিত। সাধারণভাবে আমাদের দেশে বাংলা ভাষায় এমন কোনো বই নেই, যে বইটি পড়লে যথেষ্ট জ্ঞান পাওয়া সম্ভব ! হয়তো এমন বই হতে পারে না, কিন্তু কিছু ইংরেজি ভাষার বই ছাড়া আমাদের বাংলা ভাষায় এখনও পর্যন্ত ভীষণ আবছা ধারণার কয়েকটি বই বাজারে খুব কাটে। তাই আমাদের সমস্যা প্রচুর কিন্তু সমাধানের পথ সীমিত। যেখানে তত্ত্বাবধায়কের সামনে নির্দিষ্ট সংবিধান নেই সেখানে গবেষকের কাছে কাল্পনিক সংবিধানের আশা করা বৃথা। বিভিন্ন বিদ্যায়তনিক পরিমণ্ডলে তাই বিভিন্ন নিয়ম-কানুন প্রচলিত হতে দেখা যায়। আমাদের

মতো দেশে গবেষণা করার কথা উঠলেই শুরুতেই কিছু আবছা কথা শোনা যায়। অগ্রগামী গবেষকদের মুখ থেকে শুনে গবেষক একটি কল্পনা প্রস্তুত করে। কল্পনার প্রস্তুত করতে গিয়ে অনেকে কাজটি দুরূহ মনে করে এবং জটিল বিষয় মনে করে দূরে সরে যায়। অনেকে আবার রেজিস্ট্রেশন করা পর্যন্ত দারুণভাবে তার প্রয়াসের কথা বোঝানোর চেষ্টা করে; একবার রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেলেই আর ধারেকাছে দেখতে পাওয়া যায় না।

এর পিছনে একটি বড়ো বিষয় তা হল সময়ের ব্যবস্থাপনা। এই বিষয়টি উপস্থাপন করতে সময় প্রয়োজন যথেষ্ট। কিন্তু সময়ের ব্যবস্থাপনা আমাদের থাকে না, তাই গবেষণাপত্র প্রস্তুত করতে গিয়ে প্রাথমিক কিছু সমস্যা তৈরি হয়। সময় একটি মূল্যবান সম্পদ, তাকে একবার হারালে আর ফিরে পাওয়া যায় না। কাজেই সঠিক সময়ে সঠিক করাই যুতিযুক্ত বিষয়।

৮.২ : সময়ের ব্যবস্থাপনা

একটি কাজ সময়ে শেষ করলে যে গুরুত্ব পায়, সেই একই কাজ সময়ের বাইরে গিয়ে সমাপ্ত করতে না পারলে তা আর কাজ থাকে না, বা সেই কাজের গুরুত্ব হরিয়ে যায়। সময়কে যিনি গুরুত্ব দেন সময় তাকে গুরুত্ব দেয়। সেই কারণে পেশাগত জীবনে ও ব্যক্তিগত কারণে সময়ের হেরফের হলেই জীবনে ও কর্মস্থলে ব্যর্থতা নেমে আসে। সময়কে আমরা যত সময়মতো ব্যবহার করতে শিখবো ততই আমাদের কাজের জন্য সুবিধা হবে।

একজন গবেষক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মমতো নিবন্ধনের তারিখ থেকে ৫ বছর সময় হাতে পান। তার পরেও যদি মনে করেন যে, আরও কিছুদিন সময় হাতে পেলে কাজটি সম্পূর্ণ করতে সুবিধা হবে; তাহলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মমতো বিভাগীয় রিসার্চ কমিটির কাছে আবেদন রাখতে পারেন সময়সীমা বাড়ানোর জন্যে। ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে অনুমতি দিলে তিনি কিছু সময় বাড়তি পেতে পারেন। আবার যদি তিনি মনে করেন নির্ধারিত বর্ধিত সময়সীমার মধ্যে জমা দিতে পারবেন না তাহলে তিনি তাঁর গবেষণা প্রক্রিয়াটি বাতিল করতে পারেন নির্দিষ্ট পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে গিয়ে। সব ক্ষেত্রেই খেয়াল রাখতে হবে সব মিলিয়ে প্রথম নিবন্ধনের তারিখ থেকে জমা দেওয়ার মধ্যে সময় যেন ছয় বছরের বেশি না হয়। অবশ্য মহিলা গবেষকদের ক্ষেত্রে এই নিয়মটি পৃথক। তবে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকলে ও ব্যবস্থাপনা থাকলে দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া সম্ভব। আমাদের কাজের মধ্যে যখনই এই নিয়ন্ত্রণ থাকে না তখনই আমাদের মধ্যে মানসিক চাপ, উদ্বেগ ও বিষণ্ণতার জন্ম হয়। সেখানে থেকে অনেক গবেষক কাজ সম্পূর্ণ না করেই বিভিন্ন রকমের সংগতিহীন যুক্তি উপস্থাপন করে দায়িত্ব থেকে দূরে থাকবার চেষ্টা করেন।

৮.৩ : গবেষকের দায়িত্ব

গবেষককে বুঝতে হবে জীবনের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হল দায়িত্ববান হয়ে ওঠা। বিষয়টি অবশ্য শুধু গবেষকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, তত্ত্বাবধায়কের জন্যেই এই একই কথা প্রযুক্ত হতে পারে। কোর্সওয়ার্ক চলাকালীন গবেষণা সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়গুলিকে বিভিন্নভাবে আলোচনা করা হয় যার প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রবণতা থাকে গবেষকদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা। গবেষণা কোনো অসাধ্যসাধন নয়; দায়িত্বগুলি সাবধানতার সঙ্গে পালন করলেই সমস্ত প্রকল্পরচনার কাজটি সাফল্য ও কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করা সম্ভব। একটি গবেষণা প্রকল্প রচনা করা একক কাজ নয়, যৌথ সহযোগিতা না থাকলে বিষয়টি সম্পন্ন করা প্রায় অসম্ভব। সাহিত্যবিষয়ক একটি গবেষণার কাজ করতে গেলে লাইব্রেরি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিভাগ অনেকাংশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং গবেষক, তত্ত্বাবধায়ক এবং অন্যান্য ক্ষেত্র প্রভৃতি সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে একটি প্রকল্প নির্বিঘ্নে নির্মাণ হতে পারে বা রচিত হতে পারে। সকলের থেকে বেশি দায়িত্ব থাকে গবেষকের। তাই বেশি করে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। এই দায়িত্ব পালন করার কয়েকটি আনুমানিক প্রসঙ্গের দিক উন্মোচিত করা যেতে পারে যেমন—

পরিকল্পনা

সময় এমন একটি সাবজেক্ট বা বিষয় যাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হলে জীবনে যেমন উন্নতি সম্ভব, যে-কোনো প্রকল্পরচনায় ঠিক ততখানি অগ্রগতি সম্ভব। সারাজীবনে বহুমূল্যবান এই সময় একবার হারিয়ে গেলে আর হারিয়ে যাওয়া সময়টিকে ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই তাকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে পারলে সাফল্য স্বাভাবিক পথেই আসা সম্ভব। এই পরিকল্পনা শুধু বাহ্যিক হলেই হবে না, অভ্যন্তরীণ হতে হবে। অর্থাৎ সম্ভবনাময় সমস্তকিছু ভেবে নিয়ে কাগজে লিখে পরিকল্পনা তৈরি করলে ভুল হবার বা ভুলে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে না। প্রথমত প্রস্তাবিত বিষয়টিকে অধ্যায় বিভাজন করে প্রত্যেকটি অধ্যায়ের জন্যে গুরুত্ব অনুযায়ী সাজিয়ে প্রতিটির জন্যে উপযুক্ত সময় নির্ধারণ করতে হবে। দ্বিতীয়ত প্রকল্পটিকে উপস্থাপন করতে কত সময় প্রয়োজন হতে পারে তার একটি আনুমানিক পরিকল্পনা প্রয়োজন। যেমন প্রকল্পের তথ্য সংগ্রহ, খসড়া তৈরি করা, টাইপ, এডিট করা, সংশোধন করা, প্রুফ দেখা ও বাঁধাই করা এবং শেষমেষ জমা দিতে গেলে যে প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, সেই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করার সম্ভাব্য সময় সম্পর্কে সঠিক পরিকল্পনা প্রয়োজন। এর মধ্যে সংশোধনের কাজ হওয়া উচিত কমপক্ষে এক বছর। এই অংশটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই সংশোধনের উপর দাঁড়িয়ে থাকে প্রকল্পটির ভবিষ্যৎ। সকল তত্ত্বাবধায়ক হয়তো এই একটি বিষয়ে সহমত হবেন যে, এই পর্বটির জন্যে গবেষকের হাতে বরাদ্দ সময় ভীষণ সংক্ষিপ্ত হয়ে যায় নানান কারণে, অনেকক্ষেত্রে সময়

থাকেই না প্রায়। সেক্ষেত্রে সংশোধনের জন্যে পর্যাপ্ত পরিসর পাওয়া যায় না। নিয়মিত পরিল্পনা দেখে এগিয়ে গেলে ত্রুটিগুলি সহজেই ধরা পড়ে। সংশোধনের সময়ও যথেষ্ট থাকে; কিন্তু শেষমুহূর্তে এই কাজটি করলে 'মরণকালে হরিনাম' করার সামিল।

তৃতীয় এবং আরও একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয় আমাদের সময় সম্পর্কে মনে রাখতে হবে, সেইটি হল অন্বেষণ। এই কাজটিই গবেষণার প্রধান দিক। সময়ে যে অন্বেষণ আমাদের প্রকল্পের জন্যে মূল্যবান বিষয়, সেই কাজটি পরে হলে আর গুরুত্ব থাকে না। গ্রন্থের অন্বেষণ, মৌলিক বিষয় ও তত্ত্বের অন্বেষণ ও সাক্ষাৎকার যে-কোনো বিষয়েই হোক না কেন সময়ের একটি গুরুত্ব সেখানে থাকে।

সংকল্প

সঠিকভাবে পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত করার তাগিদে এই সংকল্প করা খুব জরুরি। প্রতিটি কল্পনাকে সঠিকভাবে রূপ দিতে দৃঢ়তার প্রয়োজন, তবেই মনোঃসংযোগ সম্ভব। এই সংকল্পের বিভিন্ন কাঠামো আছে সামাজিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক। গবেষক মহিলা বা পুরুষ যিনিই হোন তাঁকে ঠিক করতে হয় কীভাবে সামাজিক ও পারিবারিক দায়বদ্ধতা পালন করে সেগুলি বাস্তবায়িত করা যায় ! মনে রাখা প্রয়োজন বিদ্যাসাগর মায়ের সঙ্গে দেখা করবার তাগিদে খরস্রোতা নদীও পার করে গিয়েছিলেন। ফলে মানুষের দ্বারা অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলা সম্ভব।

সিদ্ধান্ত

সুস্পষ্ট বক্তব্যকে উপস্থাপন করতে হলে চায় সঠিক সিদ্ধান্ত। প্রকল্পটি উপস্থাপনে সাম্প্রতিককালের বাংলা বানানবিধি ও নিয়মকে একভাবে পালন করতে হবে। 'কাহিনি' বানান একস্থানে 'নি' ও ভিন্নস্থানে 'কাহিনী' 'নী' লিখলে চলে না। 'যাবো' যে-কোনো একটি বানান, 'যাব' ব্যবহার করতে হবে। যেখানে দু'টি বানান ব্যবহারে স্বাধীনতা আছে সেখানে একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে। গ্রন্থপঞ্জিতে লেখক বা সম্পাদকের নাম আগে না পদবি আগে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েই এগিয়ে যাওয়া ভালো। বক্তব্য সুস্পষ্ট করে তোলার জন্যে বাক্য অপ্রয়োজনীয়ভাবে জটিল না করে সরল বাক্য ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এই ধরনের বেশ কিছু বিষয় আছে যেগুলি সম্পর্কে শুরুতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখলে প্রকল্পটি সুস্পষ্ট, উদ্দেশ্যপ্রবণ, আকর্ষণীয় ও নির্ভুল করা সম্ভব হয়। প্রকল্প রচনা হোক বা অন্য কোনো কাজই হোক; কাজের মধ্যে ছন্দ থাকলে সম্মিলন থাকে। সমুদিত ভাবের সঙ্গে আত্মিকযোগ গড়ে ওঠে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে ভালোবাসা জন্মায়। কারণ আমরা জানি কোনো কাজে আনন্দ না থাকলে সেই কাজটি উন্নতমানের হয় না।

শৃঙ্খলা

আমাদের পৃথিবী পৃষ্ঠের অভ্যন্তরে ও বাইরের জগতের দিকে তাকালে দেখা যায় সর্বত্র শৃঙ্খলার মেলা। শৃঙ্খলা আছে তাই আমরা বেঁচে আছি। সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও টিকে থাকবার এক এবং একমাত্র হল সেই শৃঙ্খলা। গবেষণাকর্মটি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে হলে এই শৃঙ্খলা প্রয়োজন।

সততা

গবেষককে সবার শুরুতে সৎ হতে হবে। বিভিন্ন স্থান থেকে তথ্য পেয়ে তা সততার সঙ্গে উপযুক্ত স্থানে ঋণ স্বীকার করে নেওয়ার দায়িত্বটা হল সততার নিদর্শন। শৃঙ্খলারক্ষায় সততা প্রদর্শন করা ভীষণ জরুরি ও কার্যকর একটি বিষয়। আমরা অনেক সময় জানতেই পারি না সততা কাকে বলে! সেক্ষেত্রে কোর্সওয়ার্কের সিলেবাসে সেই বিষয়টি নতুন গবেষকদের কাছে জানানোর জন্যে প্রাসঙ্গিক হতে পারে। অনেক সময় শোনা যায় ইন্টেলেকচুয়াল চুরি সম্পর্কে গবেষকের কোনো ধারণাই ছিল না। বিষয়টি যাতে ভবিষ্যতে সত্য বলে প্রমাণিত না হয় তার জন্যে আমাদের স্বীকৃত একটি ব্যবস্থা থাকা দরকার, শুধু প্ল্যাগারিজম্ এর কথা বললে হয় না।

৮.৪ : গবেষণাপত্র টাইপ ও প্রুফ সংশোধন

একটি গবেষণা গ্রন্থ নির্মাণ করতে গেলে কম্পিউটারে তা টাইপ করার রীতি আছে। সেই ক্ষেত্রে গবেষকের দায়িত্ব থাকে নির্ভুল একটি থিসিস জমা দেওয়ার। কোথাও কোনো বানান ভুল বা চিহ্ন ভুল থাকলে গবেষকের সম্পর্কে পরীক্ষকের একটি খারাপ ধারণা তৈরি হয়। তাই গবেষককে নির্ভুল থিসিস যে-কোনো প্রকারে বা প্রকারান্তরে জমা করতে হয়। লেখা নির্ভুল করার জন্যে বারবার প্রুফ সংশোধন করা জরুরি। সংশোধন না হলে থিসিস ত্রুটিপূর্ণ থেকে যায়। বাংলা ভাষায় প্রুফ সংশোধনের জন্যে ৪৩ টি বা তারও বেশি চিহ্নের ব্যবহার হয়ে থাকে।

চিহ্ন- ১

এটি Delete, অর্থে বা কোনো কিছুকে বাদ দিতে ব্যবহৃত হয়।

চিহ্ন-২

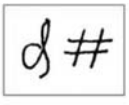

এই চিহ্নটি Delete হবে তবে Delete এর পর ফাঁকা থাকবে এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

চিহ্ন- ৩

এই সংকেতটির অর্থ পাশাপাশি কোনো শব্দ চলে আসলে ফাঁক দিতে হবে।

চিহ্ন- ৪

এই সংকেতটি দুটি শব্দের মধ্যে বেশি শূন্যস্থান এসে গেলে স্থানটি পূরণ করার জন্যে ব্যবহৃত হয়।

চিহ্ন- ৫

এই সংকেতটির অর্থ Bold অথবা মোটা হরফ হবে।

চিহ্ন- ৬

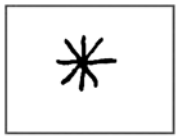

রচনার মধ্যে যদি কোনো ভাঙ্গা হরফ চলে আসে তাহলে তাকে পরিবর্তনের জন্যে এই চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়।

চিহ্ন-৭

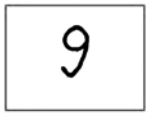

কোনো হরফ উলটো বসে গেলে তাকে পরিবর্তন করে হরফ সোজা করার জন্যে এই চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়।

চিহ্ন- ৮

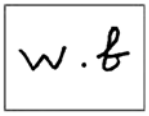

একটি রচনায় ভিন্ন হরফ ব্যবহৃত হলে তার সংশোধন করার জন্যে এই সংকেতটি ব্যবহার করা হয়।

চিহ্ন ৯

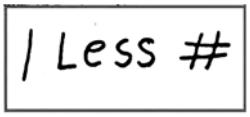

রচনায় ফাঁকা অংশের পরিমাণ কমানোর সংকেত এইটি। অর্থাৎ ফাঁক বেশি হলে কম করতে বলা হয় এইভাবে।

উপরে উল্লিখিত এই ধরনের চিহ্ন বা সংকেত ব্যবহার করে প্রুফ সংশোধন করতে হয়। কোন গ্রন্থে বা থিসিসে কোথাও বানান, বাক্যগঠন বা কোনো বিষয়ে যদি ভুল থাকে তাহলে বক্তব্য স্পষ্ট হয় না, অথবা যা আমরা উপস্থাপন করতে চাইছি তার সম্পূর্ণ হবে না। তাই অধিক জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও একটি থিসিস বা গ্রন্থ ভালো বলে বিবেচিত হয় না। তার শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে প্রুফ সংশোধন করে তার সঠিক ও নির্ভুল প্রয়োগে। তাই সমস্ত কাজ শেষ হলে নিজের কাজটি কোনো ভাড়া করা টাইপিস্টকে দিয়ে টাইপ না করানই ভালো। নিজের কাজের টাইপ নিজে সম্পূর্ণ দায়িত্বসহকারে করলে পুনর্বিচারের সুযোগ থাকে বিস্তর। সংশোধনের এই পর্বে চিহ্নের পাশাপাশি খেয়াল রাখতে হয় প্রদত্ত তথ্য, বানান, বক্তব্য, শব্দ-বিন্যাস, বাক্যগঠন, ছেদ বা যতিচিহ্ন, সমাস, সন্ধি, ণত্ববিধান, ষত্ববিধান প্রভৃতি। এই সমস্ত বিষয় নজরে রেখে প্রুফসংশোধন করতে শুরু করা হয়। অর্থাৎ চোখ ও মনের গভীরতর সংযোগ না থাকলে এই কাজটি ভালো হয় না। ভাবের কথা মাথায় রেখে পড়লে অনেকসময় চোখে পড়ে না; আবার বাহ্যিকভাবে দেখতে গিয়ে বক্তব্যবিষয়টি নজরে আসে না। তাই দুইকে এক করে দেখা বা দেখতে শেখা এইটি একটি বিশেষ ধরনের অভ্যাস। এই অভ্যাসটিকে গবেষকের শুরুতেই রপ্ত করতে পারলে খুব ভালো হয়।

৮.৫ : এডিটিং

আমাদের প্রতিদিনের জীবন থেকে এই শিক্ষা আমরা সবথেকে ভালোভাবে নিতে পারি। প্রাত্যহিক জীবনের সমস্ত কিছু আমরা তুলে রাখি না বা সংগ্রহ করি না। সেক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট মাত্রা ও বিষয় অনুযায়ী সংরক্ষণ করে রাখি। তাই এই নির্বাচন ও উপস্থাপন যে-কোনো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি বিষয়।

এডিট করার প্রাথমিক শর্তই হল পরিমিত স্থানে বিষয়, ছবি ও সংকেতগুলি যথাযথভাবে সন্নিবেশিত করা। পৃষ্ঠার মাপ, অক্ষরের মাপ, ছবি বসানো হলে তার স্থান নির্বাচন করে সুন্দর করে তোলা প্রভৃতি হল এডটিং —এর কাজ।

বিষয়ের কথা ছেড়ে দিয়ে প্রয়োগের দিকে দৃষ্টি দিলে বেশ কিছু টুলের দিকে আমাদের নজর রাখতে হয়। যেমন বাংলা হরফে টাইপ করার সময় বেশি ব্যবহৃত এবং সুপ্রচলিত মাধ্যম ব্যবহার করতে হয়। 'অভ্র বাংলা' এক্ষেত্রে একটি নির্ভরযোগ্য সফট্ওয়ার। এখানে টাইপ করলে 'কালপুরুষ' এবং ১৪ ফ্রন্ট ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত। এইভাবে ডানদিক বামদিক ও আরও অন্যান্য বিষয়গুলিকে নজরে রেখে গবেষণাপ্রকল্পটিকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

৮.৬ : উপসংহার

গবেষণা এমন একটি কাজ যেখানে ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির ঊর্ধ্বে গিয়ে বিদ্যাজগতের সর্বোচ্চ ডিগ্রি প্রদানকারী শিক্ষালয় ও সমজের তথা দেশের স্বার্থ জড়িয়ে থাকে। বিশেষ একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে পরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট পথে অনুসন্ধানের কাজ করে সেই প্রকল্পটিকে সুগ্রথিত করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার নাম গবেষণা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। সুতরাং এই কর্মটির মহত্ত্ব বা মূল্য শুধু একটি সীমিত পরিসরে আবদ্ধ থাকে না, সমকাল ও পরকালের জন্যে একটি প্রামাণ্য দলিল হিসেবে বিশেষভাবে সংরক্ষিত থাকে। যে বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান এই সংরক্ষণের বিষয়টিকে যত গুরুত্ব দেয় সেই প্রতিষ্ঠান ততই সমৃদ্ধ হয়। গবেষকের শ্রমলব্ধ যে জ্ঞান ও জ্ঞানের পরিধি সমগ্র পৃথিবী দেখতে পায় তাকে তো দৃষ্টান্তমূলক হতেই হয়। তাই এই আলোচনাটির এতো গুরুত্ব।

৮.৭ : আদর্শ প্রশ্ন

১। একজন গবেষকের কাছে গবেষণা প্রকল্পটি উপস্থাপন করতে গিয়ে সময়ের বিন্যাসকে কীভাবে কাজে লাগানো উচিত বলে তুমি মনে করো সে সম্পর্কে একটি মতামত দাও।

২। গবেষকের দায়িত্ব কী কী থাকা একান্তভাবে কাম্য বলে তুমি মনে করো তার বিবরণ দাও।

৩। যে-কোনো একটি গবেষণা প্রকল্পটি উপস্থাপন করতে গেলে প্রুফ সংশোধন ও এডিট করার ক্ষেত্রে কেমন সচেতনতা প্রয়োজন তা দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা করো।

৪। প্রুফ সংশোধন বিষয়ে প্রুফ দেখার চিহ্নগুলির পরিচয় দাও।

৮.৮ : সহায়ক গ্রন্থ

শ্রাবণী পাল ও বেলা দাস (সম্পা :)- গবেষণার তত্ত্বতালাশ

Ranjit Kumar — Research Methodology

Dr. Prabhat Pandey & Dr. Meenu Mishra Pandey Research Methodology — Tools and Techniques

C.R. Kothari — Research Methodology : Methods and Techniques

একক - ৯

প্লেগারিজম

বিন্যাস ক্রম :

৯.১ : ভূমিকা

৯.২ : সহায়ক রচনা

৯.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৯.১ : ভূমিকা

গবেষণার ক্ষেত্রে প্লেগারিজম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শুধু গবেষণাসন্দর্ভ নির্মাণের ক্ষেত্রেই নয়, গবষণা বিষয়ক যে কোনো লেখা প্রকাশের ক্ষেত্রেই প্লেগারিজম নির্ণয় করতে হয়। এই কুম্ভীলকবৃত্তি আজকের ঘটনা নয়, তা দীর্ঘকালের একটা অসদুপায়। অন্যের লেখা থেকে কোনো রকম অনুমতি না নিয়ে নিজের লেখায় ব্যবহার করে প্রকাশ করাকেই প্লেগারিজম বলে। গবেষণায় সাধারণত নতুন দিকের আবিষ্কার ঘটে। কিন্তু কুম্ভীলকবৃত্তি অবলম্বন করলে পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থার নিরিখে গবেষণার যে বিশুদ্ধতা থাকা দরকার তা অনেকাংশেই ঘটছে না। গবেষণার মান ক্রমশ তলানিতে পৌঁছচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন তাই উদ্যোগী হয়েছে নিয়ম করে কুম্ভীলকবৃত্তি দমন করতে। প্রতিটি প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে প্লেগারিজম প্রক্রিয়া বাধ্যতামূলক হয়েছে। তা প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে হোক বা ব্যক্তিগত স্তরে।

অন্য কোন রচনা থেকে ভাব, বিষয় কোনরকম তথ্যঋণ স্বীকার না করে নিজের গ্রন্থে ব্যবহার করে প্রকাশ করার রীতিকে প্রকৃতপক্ষে প্লেগারিজম বলে। Plagiarism শব্দটি Plagarius থেকে আগত। যার অর্থ Kid robber, Misleader, Literary Thief। প্রথমে এর অর্থ ছিল কৌশলে ও প্রতারণা করে কারো কোন কিছু দখল করা, আয়ত্ত করা। পরবর্তীতে এর অর্থ হয়, কোন গ্রন্থ

থেকে তথ্য চুরি। প্লেগারিজম মূলত চুরিরই প্রকারভেদ। Wilson Mizner উল্লেখ করেছেন—"When we steal an idea from one another, it will be called Plagiarism, but when we do it from a few authors, it is called research." [গবেষণায় তত্ত্বতালাশ, কুম্ভীলকবৃত্তি (Plagiarism): একটি পর্যবেক্ষণী, শ্রাবণী পাল, বেলা দাস (সম্পাদনা), পারুল প্রকাশনী, পৃ: ৮২] যিনি অন্যের লেখা থেকে শব্দ, ভাষা, ভাব, ধারণা হুবহু অনুকরণ করে নিজের নামে চালিয়ে নেন তাকেই প্লেগারিস্ট বলে।

প্লেগারিজম বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন পথে আসতে পারে। কোন গ্রন্থ থেকে কোনরূপ ঋণস্বীকার না করে কোন অংশ বা ধারণা নিজের বলে প্রতিপন্ন করাকে Verbatim Plagiarism বলে। একজন লেখক নিজের লেখা থেকেই কোনরূপ ঋণস্বীকার না করে পুনরুৎপাদন করলে তাকে Self Plagiarism বলে। সেলফ প্লেগারিজম-এর আবার তিনটি দিক আছে। ক. ঋণস্বীকার না করে নিজের লেখার পুনরাবৃত্তি খ. একটি বড় লেখাকে কয়েকটি ছোট ছোট অংশে বিভাজিত করে প্রকাশ করা, যাকে Salami Slacing বলে। গ. একই রচনার পুনঃপ্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। কপিরাইট তথা গ্রন্থসত্ত্বের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। আবার Artistic Plagiarism ও দেখা যায়। ইচ্ছাকৃত ভুল তথ্যসূত্র দেওয়া, ব্যাকরণিক গঠনের পরিবর্তন করে দেওয়া, পদবিন্যাস পালটে দেওয়া, সমার্থ শব্দ ব্যবহার করা বা পরিবর্তিত শব্দ ব্যবহার করতে পারে প্লেগারিজমের আওতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য।

বিভিন্ন মানদণ্ডকে সামনে রেখে প্লেগারিজমের শ্রেণিকরণ করা হয়। যেমন প্রবণতাগত দিক থেকে প্লেগারিজমের দুটি ভাগ—ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত অর্থাৎ ইন্‌টেনশনাল ও আনইন্‌টেনশাল। প্লেগারিজম বিষয়ে সচেতন থাকা সত্ত্বেও একজন গবেষক অন্যের লেখার ঋণস্বীকার না করে তথ্য আহরণ করলে তাকে ইচ্ছাকৃত বা ইন্‌টেনশনাল প্লোগরিজম বলে। আর একজন প্লেগারিজম সম্পর্কে অসচেতন গবেষক লেখার কৌশল, ঋণস্বীকারের কৌশল সঠিকভাবে আয়ত্ত করতে না পেরে অন্যের তথ্য নিজ গবেষণায় প্রয়োগ করলে তাকে অনিচ্ছাকৃত বা আনইন্‌টেনশনাল প্লেগারিজম বলে। অপর আরেকটি মানদণ্ডের নিরিখে প্লেগারিজমের চারটি ভাগ—

ক. ক্যাজুয়াল প্লেগারিজম—যা সচেতনতার অভাবের জন্য ঘটে

খ. আনইন্‌টেনশনাল—পূর্বে আলোচিত

গ. ইন্‌টেনশনাল বা ইচ্ছাকৃত—পূর্বে আলোচিত

ঘ. সেলফ প্লেগারিজম—ঋণস্বীকার

এগুলি বাদ দিয়েও প্লেগারিজমের আরও কতগুলি শ্রেণীর কথা বলা হয়। যথা:

অ্যাকসিডেন্টাল প্লেগারিজম—একজন লেখক/গবেষক গবেষণাপত্র রচনার সময় উৎস নির্দেশ করতে গিয়ে ভুল উৎস নির্দেশ করেন কিংবা ভাষান্তরিত করার সময় অনিচ্ছাকৃত সাদৃশ্যবাচক শব্দ, বাক্য, বাক্যক্রম পুনরুৎপাদন করে থাকেন। আবার কখনো কোন গবেষক উদ্ধৃতি ব্যবহার না করে কোন উৎস থেকে নিজের লেখায় বাক্য, পদগুচ্ছ গ্রহণ করে অথবা কোন লেখকের লেখার গঠন বা অর্থ ঠিক রেখে সমার্থক শব্দ বা ভাষা পরিবর্তন করে নিজের লেখা বলে চালিয়ে দেওয়া হয় যাকে আমরা মোজাইক প্লেগারিজম বলি। আছে 'ডাইরেক্ট প্লেগারিজম' যেখানে হুবহু বা আক্ষরিক অনুসরণ করা হয়।

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে একজন গবেষক কেন কুম্ভীলক বৃত্তির পথে চালিত হয়। রবার্ট হ্যারিস প্রত্যক্ষ করেছেন, গবেষকগণ কম সময়ে স্বল্প প্রয়াসে সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছাড়াই গবেষণাপত্র রূপায়ণে অগ্রসর হচ্ছে। তার ফল হচ্ছে মারাত্মক। গবেষণার এথিকস ভেঙে পড়ছে। অনেক গবেষকের ধারণাই নেই কীভাবে গবেষণাপত্র রচনা করতে হয়, কীভাবে তথ্যনির্দেশ করতে হয়, উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহার করতে হয়, ভাষান্তর করতে হয়। এটা অজ্ঞতার কারণে হয়। কম সময়ে ভালো ফললাভের আকাঙ্খা যাদের জীবনের উদ্দেশ্য থাকে, তারা সহজেই প্লেগারিজমের শিকার হয়। সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক, পারিবারিক নানা ব্যস্ততার জন্য খুব কম সময়ে গবেষণাপত্র প্রস্তুত করতে চায় অনেকে। আবার অনেকে সমাজের সম্মাননীয় সর্বোচ্চ অবস্থানে নিজেকে প্রত্যক্ষ করতে চান। তাই অসদুপায়ে ডিগ্রি অর্জনের পথে অগ্রসর হন। অনেকে আবার সচেতন ভাবেই নিজেকে বা গবেষণা নির্দেশককে, প্রতিষ্ঠানকে অসম্মানিত করার জন্য এহেন কাজে অগ্রসর হয়ে থাকেন।

প্লেগারজমে রয়েছে নানা মাত্রা। কতটুকু অন্যের গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করলে প্লেগারিজমের আওতায় পড়বে বা পড়বে না তা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন—

লেভেল জিরো (জিরো লেভেল সিমিলারিটি) — ০-১০% সিমিলারিটি

লেভেল ওয়ান (লো লেভেল প্লেগারিজম) — ১০-৪০% সিমিলারিটি

লেভেল টু (মিড লেভেল প্লেগারিজম) — ৪০-৬০% সিমিলারিটি

লেভেল থ্রী (হাই লেভেল প্লেগারিজম) — ৬০% এর উপরে

১০ শতাংশের নিচে সাদৃশ্য থাকলে শাস্তিযোগ্য নয়, সন্দর্ভ পরিবর্তনযোগ্য নয়। ১০-৪০ শতাংশ মিল থাকলে সেই গবেষণাপত্র শুধরে নিয়ে পরিবর্তিত গবেষণাপত্র ছয়মাসের মধ্যে পাঠাতে হয়। সাদৃশ্য ৪০-৬০ শতাংশ হলে ওই পরিবর্তিত গবেষণাপত্র এক বছরের মধ্যে পাঠাতে হয়। আর ৬০ শতাংশের ঊর্ধ্বে হলে রেজিস্ট্রেশন বাতিল বলে গণ্য হয়। অনেক সময় একবার পরিবর্তনের পর দ্বিতীয়বারও প্লেগারিজমের আওতায় পড়লে তার রেজিস্ট্রেশন বাতিল হয়। বিভিন্ন পর্যায়ে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কথাও বলা হয়। গবেষক এবং তত্ত্বাবধায়ক উভয়েই শাস্তির মুখে পড়তে পারেন। বর্তমানে প্লেগারিজম নির্ণয়ের জন্য পৃথক সফটওয়্যার রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের বৃহত্তর দায় রয়েছে এতে। প্লেগারিজম নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়। প্রশাসনিক, তথ্যপ্রযুক্তির, অধ্যাপকদের গঠিত কমিটি বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে থাকেন।

৯.২ : সহায়ক রচনা

১। ‘UGC Public Notice, No. F. 1-18/2010 (CPP-II)’ dated 1st September 2017

২। ‘Plagiarism: Concepts, Factors and Solutions’, Bahadori M1 Ph D; Izadi M1 MD, Hoseinpourfard M1 Ph D, Indian Journal of Military Medicine, Vol. 14, No. 3 Autumn 168-177

৩। Plagiarism Policy of the Institute (2017-2018) Avinashilengam Institure for Home Science and Higher Education for Women

৪। University Grants Commission Regulation 2018

৫। Jagannath University, 'Plagiarism Policy and Regulation 2018', Approved vide Res. No. 35.16 dated 06.10.2018

৬। 'The Gazattee of India', Part-III, Section-4, No. 287, New Delhi, Tuesday, July 31, 2018/SHRAVANA 9, 1940

৭। শ্রাবণী পাল, বেলা দাস (সম্পাদিত), 'গবেষণার তত্ত্বতালাশ', ডিসেম্বর ২০২১, পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

৯.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। গবেষণার ক্ষেত্রে প্লেগারিজমের গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করো।